ফারুক-চরিত

নজির আহমদ চৌধুরী
প্রণীত।

দাম দুই টাকা মাত্র।

প্রকাশক
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
মোহাম্মদী বুক এজেন্সী
২৯, অপ্পার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—১৩৩৩

প্রিণ্টার
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম
মোহাম্মদী মেশিন প্রেস
২৯, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

لیبک الاسلام علے عمر رض

(عن ابی بن کعب عن نبی صلعم)

"ওমরের তিরোধানে এছলাম নিশ্চয় ক্রন্দন করিবে।" —হাদিছে-নববী।

আমার আরজ

٧٨٦

আমার পরম হিতৈষী বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুত জিতেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ফারুক-চরিত" সঙ্কলনের সূচনার কথা তুলিয়াছেন। কথা যখন উঠিয়াছে তখন গোড়ার যে কথাটি তাঁহার ভূমিকায় বাদ পড়িয়াছে, তাহার আভাস দেওয়াও দরকার মনে করিতেছি।

গত ১৯২১ সালের ১৯শে অক্টোবর বিচারাধীন বন্দীরূপে আমি চট্টগ্রাম জেলে প্রবেশ লাভ করি। পরবর্ত্তী ৭ই নবেম্বর বিচার-প্রহসন শেষ হয়। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট আমার কয়েকটা বক্তৃতাকে দণ্ডবিধি ১২৪ক, ১৫৩ক, ৫০৫ ও ৫০৬ ধারার অপরাধ গণ্য করতঃ কার্য্যবিধি ১০৮ ধারানুসারে আমার নিকট জামিন-মুচলিকা তলব করেন। জাতির তদানীন্তন সিদ্ধান্তের মর্য্যাদা রক্ষা কল্পে উহাতে অসম্মত হইলে আমার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়। পরদিন প্রাতঃকালে অষ্টাদশ প্রহরী বেষ্টিত হইয়া আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রেরিত হই। ৯ই নবেম্বর সন্ধ্যার পর উক্ত সেন্ট্রাল জেলে প্রবেশ করি।

অতঃপর ২১শে ডিসেম্বর আমার চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ওস্তাদ জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছাহেব বন্দীরূপে উক্ত কারাগারে গিয়া আমার সহিত মিলিত হন। কয়েক দিন পরে তিনি অধীনকে রাজর্ষি হজরত ওমর ফারুকের জীবন-বৃত্তান্ত সঙ্কলনের আদেশ করেন এবং অন্যান্য মৌলিক ইতিহাস-পুস্তকাদির অভাবে আল্লামা শিবলীর "আল-ফারুক" অবলম্বনের উপদেশ দেন। গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম, শ্রদ্ধেয় বন্ধু হাজী আবদুর রশিদ খাঁ ছাহেবের নিকট একখণ্ড "আল্-ফারুক"

[এক

পাইয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। কিন্তু শুধু অনুবাদের উপর নির্ভর করিবার সাহস আমার হইল না। তাই কারা-প্রাচীর হইতে বাহির হইয়া অনুসন্ধিৎসু বঙ্গ-ভাষা-ভাষীর খেদমতে "ফারুক-চরিত" উপস্থিত করিতে পারি নাই। তদবধি পাঁচ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আজ "ফারুক-চরিত্রে" উপহার লইয়া তাঁহাদের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা গ্রহণ করিলেই বাধিত হইব—শ্রম সার্থক মনে করিব।

হজরত ফারুকের জীবনী হিসাবে যে সকল পুস্তক আমার নজরে পড়িয়াছে তন্মধ্যে "আল্-ফারুকই" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আঙ্গোরা মহাপরিষদ ইহার তুর্কী-অনুবাদ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। মিছর, পারশ্য ও আফ্গানিস্তানেও ইহার অনুবাদের জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। সুতরাং এহেন সর্ব্বজন সমাদৃত পুস্তকের অনুবাদ বা ছায়া অবলম্বনে "ফারুক-চরিত" লিখিত হইলে কোনরূপে ইহার অঙ্গহানি হইত না—আমার পক্ষেও অগৌরবের কোন কথাই তাহাতে ছিল না। কিন্তু আমি তাহা করিতে পারি নাই। কেন পারি নাই, বিজ্ঞ পাঠক "ফারুক-চরিত" আলোচনা কালে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন বলিয়াই, আমি আশা করি।

যে সকল উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া "ফারুক-চরিত" রচিত হইল, যথাস্থানে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং স্বতন্ত্র প্রমাণপঞ্জী বোধ হয়, নিষ্প্রয়োজন।

বর্ণিত কেতাব সমূহের অধিকাংশ আমার নিজের নাই ও ছিল না। যে সকল জ্ঞানবৃদ্ধ হিতৈষীর নিকট এই পুস্তকাবলীর সাহায্য পাইয়াছি, তন্মধ্যে আমার চিরহিতাকাঙ্ক্ষী ওস্তাদ জনাব মওলানা মোহাম্মদ মুনিরুজ্জমান এছলামাবাদী, মওলানা আবুল বরকাত আবদুর রউফ দানাপুরী ও মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছাহেবানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুস্তকের সাহায্য ব্যতীত তাঁহাদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশের দ্বারাও আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

সুহৃদবর মওলবী আয়নল হক খাঁ, মওলবী ফজলুল হক সেলবর্ষী, মওলবী মোহাম্মদ নেজামত আলী খাঁ শেরওয়ানী ও মওলবী কবি শাহাদৎ হোছেন ছাহেবান প্রুফ পড়িয়া আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমাদের সম্মিলিত যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও প্রেসের ভূতকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারি নাই। আশা করি, এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠক মহোদয়গণ গ্রন্থকারকে মার্জ্জনা করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমার প্রিয় বন্ধু মওলবী মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ ছাহেব নদবী এই পুণ্য জীবন-কথার "ফারুক-চরিত" নামকরণ করিয়া আমাকে নামকরণ-সমস্যার সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ইতি

কলিকাতা,
আশ্বিন, ১৩৩৩।

নজির আহমদ চৌধুরী।

ভূমিকা

—:০:—

মৌঃ নজির আহমদ চৌধুরী সাহেব রচিত এই পুস্তক খানির ভূমিকা লিখিবার সুযোগ পাইয়া আমি বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই পুস্তক ও ভূমিকার সহিত একটি কাহিনী সংশ্লিষ্ট আছে। আশা করি, বর্ত্তমানে তাহার উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মৌলবী সাহেবের সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় আমার অনেক দিন হইতে ছিল। সেই পরিচয় ভাল করিয়া জাঁকিয়া উঠিল এক বিচিত্র স্থানে —সরকারের জেলখানায়। ১৯২১ সালের ৭ই ডিসেম্বর আমি বন্দীরূপে Alipore Central Jailএ প্রবেশ লাভ করি; তাহার মাসেক কাল পূর্ব্বে সেন-গুপ্ত প্রভৃতি চট্টগ্রামের অন্যান্য কর্ম্মিবৃন্দের সহিত মৌলবী সাহেবও তথায় আনীত হন। তখনও Alipore Jailএ political prisoner এর সংখ্যা তত বেশী হয় নাই, ৩নং European wardএ প্রায় সকলেরই স্থান সঙ্কুলান হইয়াছিল। অন্ততঃ দিনের বেলায় সকলেই একত্র কাটাইতে পারিতাম এবং সেই হইতে প্রায় ১০ মাস মৌঃ নজির আহমদ চৌধুরীর সাহচর্য্য উপভোগ করিতে পাওয়া আমার জীবনের একটা বিশেষ সৌভাগ্য মনে করি।

প্রথম কয়েক দিনের পরেই নূতন নূতন রাজবন্দীর দল বন্যার স্রোতের মত আলিপুর জেলে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং শীঘ্রই আমরা ৪০০ ছাড়াইয়া উঠিলাম। জাতি ও ধর্ম্ম হিসাবে আমরা বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান ও মাড়োয়ারী এই তিন দল ছিলাম। সকলেই একত্রে বা পাশাপাশি থাকিতেন; কিন্তু রাঁধিবার জন্য পৃথক পৃথক 'চৌকার' ব্যবস্থা ছিল।

এই তিন দলের মধ্যে আমি আহার করিতাম মাড়োয়ারীদের সঙ্গে, কিন্তু আমার দিন কাটিত প্রায় মুসলমান বন্দীদিগের সাহচর্য্যে।

ইহার একটু কারণ ছিল। জেলে যখন যাই তখন ইস্লাম ধর্ম্ম ও ইসলামীয় সভ্যতার ইতিহাস এক রকম জানিতাম না বলিলেই চলে; এখন কারাগারে বহু পণ্ডিত মৌলবী মৌলানাকে একত্রে পাইয়া এই অভাব পূরণ করিবার লোভ হইল। পাঠ্যাবস্থায় যেমন উৎসাহের সহিত ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ করিতাম তেমনই উৎসাহের সঙ্গে ইস্লাম ধর্ম্ম ও ইতিহাস পাঠ করা সুরু করিলাম এবং আমার আগ্রহ দেখিয়া মৌলানাগণও দয়া করিয়া মুখে মুখে নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন। মৌঃ আক্রম খাঁ সাহেব, মৌঃ আবদুর রউফ সাহেব দানাপুরী এবং মৌলানা আজাদ সাহেব ইঁহারা সকলেই একত্রে রাজবন্দী, কোরান্ হাদিস ও Islamic ইতিহাসে ইঁহাদের সকলেরই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য; এবং Islamic সাহিত্য ও ইতিহাস আমি যাহা কিছু শিখিতে পারিয়াছি তাহার জন্য ইঁহাদের নিকট আমি কি পরিমাণ ঋণী তাহা বলিতে পারি না।

কিন্তু এক পক্ষে আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণ মৌলবী নজির আহমদ সাহেবের নিকট। পূর্ব্বোক্ত মৌলানাগণ বড় বড় পণ্ডিত; পাছে উপহাস করেন বলিয়া সর্ব্বপ্রকার খুঁটি-নাটি প্রশ্ন নিয়া তাঁহাদের বিরক্ত করিতে সাহস করিতাম না। কিন্তু নজির আহমদ সম্বন্ধে সে ভয় ছিল না; তাঁহাকে বে-পরওয়া হইয়া সকল বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়া নিতাম এবং এই ভাবেই আমার জ্ঞানের গোড়া পত্তন হয়। তখন হইতেই জানিতাম যে মৌঃ সাহেব হজরৎ ওমরের পবিত্র জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্প করিয়াছেন এবং তখন হইতেই ঠিক ছিল যে পুস্তক সমাপ্ত হইলে আমি তাহার ভূমিকা লিখিয়া দিব—পাঁচ বৎসর পরে সেই প্রতিজ্ঞাপালনের সময় আসিয়াছে।

জেলের মধ্যে অনেকে পুস্তকাদি রচনা করিতেন—তাহার মধ্যে কয়েক

খানি প্রকাশিতও হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যহিসাবে জেলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান মৌঃ আকরম খাঁ সাহেবের "মোস্তফা-চরিত" এবং তৎপ্রণীত "আম-পারার অনুবাদ।" যদি বলি যে "মোস্তফা-চরিত" বাংলা ভাষায় লিখিত চরিত-কাহিনী সমূহের মধ্যে এক খানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক তাহা হইলে কিছুই বলা হইল না, বুঝিতে হইবে। এরূপ critical এবং well-documented biography জগতের যে কোন সাহিত্যের সম্পদ রূপে গণ্য হইবার যোগ্য। 'আম- পারার অনুবাদ'ও এক বিচিত্র ব্যাপার। কোরানের দুরূহ পদাবলীর যে এরূপ মনোহর ও গভীর ভাবপূর্ণ অনুবাদ বাংলা ভাষায় সম্ভব পূর্ব্বে কেহ কল্পনাতেও তাহা আনিতে পারিতেন না। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা বলে মৌঃ সাহেব অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় এমন অমূল্য গ্রন্থেরও শিক্ষিত হিন্দু সমাজে তেমন আদর হয় নাই। নানা কারণে ইহা যার পর নাই পরিতাপ ও ক্ষোভের কথা। আমরা মুখে বলি হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কথা। শুধু মুখে বলি তাহা নহে, এটা স্বতঃ সিদ্ধ প্রতিজ্ঞার মত খাঁটি কথা যে হিন্দু মুসলমানের প্রীতি ব্যতিরেকে বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। কিন্তু এই ঐক্য ও সম্প্রীতি আসিবে কোথা হইতে? খালি Politics হইতে ইহা আসিতেই পারে না; কারণ Politics দ্বন্দ্বের স্থান, সেখানে right, privilege, অধিকার লইয়া কাড়াকাড়ি, ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা প্রতি পলে উত্থিত হয়। তাই Politics এ ঐক্য না হইয়া কেবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং ফলেও তাহাই হইয়াছে। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য ভিন্ন গতি নাই ইহা যেমন স্বতঃসিদ্ধ, মনের আদান প্রদান না হইলে সেই ঐক্য হওয়াও সম্ভব নহে ইহাও তেমনই স্বতঃসিদ্ধ; এবং এই মনের আদান প্রদান কেবল মাত্র সাহিত্য এবং ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই হইতে পারে, আর অন্য উপায় নাই। আমি হিন্দু, যতদিন আমার ইস্‌লামের ভাব চিন্তা, জ্ঞান রাশি এবং ধর্ম্ম বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা-বুদ্ধি না জাগে, এবং তিনি মুসলমান,

যতদিন হিন্দুর ভাব চিন্তা, জ্ঞানরাশি এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি না জাগে, ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের কথা বাতুলের স্বপ্ন মাত্র। এই শ্রদ্ধাবুদ্ধির উদ্রেক উভয় দলের পক্ষেই প্রয়োজন—আমার মনে হয় বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে আরও বিশেষরূপে প্রয়োজন। কথাটা আরও বিশদ করিয়া বলি। "মুসলমানেরা অশিক্ষিত, গোঁয়ার, তাহাদের ধর্ম্ম মারামারি কাটাকাটির ধর্ম্ম, তাহাতে আর শিক্ষা করিবার কি আছে?" এইরূপ একটা অভিমান ও কুসংস্কার শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে অনেকে অন্তরে পোষণ করেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। যদি কেহ গায়ের জোরে বলেন "করি না" তবে আমি নাচার। কিন্তু সত্যান্বেষী কেহই একথা অস্বীকার করিবেন বলিয়া আমি মনে করি না। যাহা হউক এরূপ অভিমান যে একান্ত অজ্ঞতা প্রসূত তাহার জন্য বড় প্রমাণ দিবার আবশ্যক নাই। যে মুসলমান আল্লাহ্‌র প্রথম বিশেষণরূপে প্রয়োগ করেন 'রহমান্' ও 'রহিম' সেই মুসলমানের ধর্ম্ম-মারামারি কাটাকাটি বা গোঁয়ারতুমির ধর্ম্ম, এ কথা মনে করাও পাপ! অথচ এই একটা ধারণা শিক্ষিত হিন্দুর মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, এবং আমি আবার বলিতে পারি যে ইহার একমাত্র কারণ পরস্পরের মত এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত পরিচয়ের অভাব।

এই অজ্ঞতা এবং অপরিচয়ের জন্য উভয় পক্ষই কতকটা দায়ী—হয়ত বা শিক্ষিত মুসলমানেরই এ বিষয়ে অধিকতর শৈথিল্য। হিন্দু বলিতে পারেন,—"মুসলমানদের মত, ধর্ম্ম-বিশ্বাস বা ভাব ও চিন্তার ধারা জানিব কি প্রকারে? মুসলমান ত' বাংলা সাহিত্যের তেমন আলোচনা করেননা বা বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া তাঁহাদের মত ও বিশ্বাস প্রচার করিতে চেষ্টা করেন না।" এতদিন একথা বলা চলিত; কিন্তু আর বলা চলে না। মৌঃ আকরম খাঁর দুইখানি পুস্তকের কথা প্রথমেই বলিয়াছি; তাহারা এই অভাব অনেক পরিমাণে পূরণ করিয়াছে

এবং বন্ধুবর মৌঃ নজির আহমদ চৌধুরী সাহেবের বর্ত্তমান পুস্তক খানিও এই অভাব দূর করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে। গ্রন্থখানি শুধু হজরৎ ওমর ফারুকের জীবন-চরিত নহে, সংক্ষেপের মধ্যে ইহা ইস্‌লাম ইতিহাসের প্রথম যুগের একখানি উজ্জ্বল চিত্র। ইস্‌লাম প্রচারের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে একটী বিচিত্র ব্যাপার সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি। সেটি এই যে, হজরৎ মোহাম্মদের মৃত্যুর ৬০ বৎসরের মধ্যে ইস্‌লামের বিপুল শক্তি পশ্চিমে Atlantic মহাসাগর হইতে পূর্ব্বে আরব সাগর পর্য্যন্ত উচ্ছলিত বেগে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই যে বিরাট সম্প্রসারণী শক্তি ইহা আসিল কোথা হইতে? শুধু গায়ের জোরে, পাশবিক বলে, তরবারীর খেলায় এ শক্তি কখনও আসে না। নিশ্চয় ইস্‌লামের রাজ্য-শাসন পদ্ধতির মধ্যে এমন কিছু ছিল যাহা জগতের পক্ষে নূতন, যাহা তৎকালীন জগতের লোক আনন্দের সহিত লুটিয়া লইল। অবশ্য এই নীতি পদ্ধতি শাসন প্রণালী ও ব্যবস্থা সকলেরই মূল হজরৎ মোহম্মদের উপদেশ ও কোরানের বাণী। কিন্তু শুধু উপদেশ ও গ্রন্থ নিবদ্ধ বাণীতে এমন বিরাট শক্তি আনিয়া দেয় না। ইহার পিছনে ছিল একটা বিশাল মানবত্বের অতুলনীয় প্রভাব এবং এই মানবত্বের মূর্ত্ত স্বরূপ, ইহার সম্যক স্ফূর্ত্তি ও প্রকাশ, আমরা দেখিতে পাই, হজরৎ ওমরের মহিমাময় জীবন কাহিনীর মধ্যে।

খৃষ্টান জগতে St Paul এর স্থান যেখানে, নানা রূপান্তর ভেদের মধ্যেও এমন বলা যাইতে পারে যে, ইস্‌লাম জগতে ওমরের স্থানও সেই খানে। যেমন খৃষ্টান ধর্ম্মের ব্যাপ্তির মূলে St Paul এর ব্যক্তিত্ব তেমনি ইস্‌লামের অদ্ভুত প্রসার ও বৃদ্ধির মূলে হজরৎ ওমরের বিশ্ব-বিজয়িনী শক্তি। তবে St Paul ছিলেন কেবল উপদেষ্টা ও প্রচারক—ওমর একাধারে উপদেষ্টা, প্রচারক ও রাজা—একাধারে Paul এবং Constantine.

চরিত্রগত আরও বহু মিল দুয়ের মধ্যে আছে। Paul প্রথম জীবনে খৃষ্টান ধর্ম্মের অরি ছিলেন, ওমরও হজরৎ মোহাম্মদের প্রচারিত নব ধর্ম্মের বিপক্ষবাদী ছিলেন; উভয়েরই আশ্চর্য্য ভাবে মত-পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, এবং উভয়েই ভাবীকালে স্বীয় ধর্ম্মের প্রধান স্তম্ভ হইয়া উঠেন। কিন্তু এই সকল কথার বিস্তৃত আলোচনা এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় সম্ভবপর নহে। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম ও গবেষণার ফল স্বরূপ হজরৎ ওমর সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, জিজ্ঞাসু পাঠক ইহা পাঠ করিয়া প্রীত ও মুগ্ধ হইবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

মুসলমান শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা এবং এই ভ্রান্ত ধারণার বশে আমরা মুসলমান রাজগণের প্রতি কিরূপ অবিচার করিয়া থাকি, পাঠক গ্রন্থকারের 'জিজিয়া' কর সম্বন্ধে আলোচনা পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। পুস্তক খানিতে যদি আর কিছু না থাকিত তাহা হইলে এই এক বিষয়ের জন্যই আমি গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতাম।

পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আমার নাই। তবে গ্রন্থকার সাধু ও সরল প্রকৃতির লোক এবং পুস্তকের প্রতি পত্রে, প্রতি ছত্রে তাঁহার সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমি পুস্তকের বহুল প্রচার ও সাফল্য কামনা করি।

কলিকাতা,
২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬। } শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلوة على رسوله محمد و اله واصحابه اجمعين

আধুনিক সভ্য জগতের উন্নত শির এছলাম ও মোছলেম জাতির ঋণভারে অবনত। "History of Freedom" এর লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক লর্ড এক্টন বলেন,—The faculty of exact reasoning of accurate observation became extinct and even the sciences most needful to society fell into decay until the teachers of the West went to school at the feet of the Arabian masters.

অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও সমাজ-নীতি পাশ্চাত্য জগত হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পশ্চিম দেশীয় শিক্ষকগণ আরব-গুরুদিগের চরণ-তলে শিক্ষালাভ করিয়াই সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও সমাজ-নীতির পুনর্জ্জীবন দান করেন। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক এই সকল ঋণদ আরব-গুরুদিগের অন্যতম।

শাহ্ অলিউল্লাহ্ ছাহেব মরহুম বলেন ঃ—

"ফারুকে আ'জমের হৃদয়-দেশ এক বিশাল মন্দির সদৃশ। ইহার এক দ্বারে দিগ্বিজয়ী বীর সেকান্দর যেন অগণিত সৈন্য-সামন্ত সহ শত্রু-দমনের কঠোর সঙ্কল্প লইয়া অদ্ভুত রণ-কৌশল ও রাজ্য-বিস্তারের অযুত উপায় শিক্ষাদান করিতেছেন। অন্য দ্বারে নওশেরওয়াঁ যেন আদর্শ বিচার ও প্রজাপালন-নীতির প্রচার করিতেছেন। অপর দ্বারে স্বয়ং এমাম আবু হানিফা বা এমাম মালেক যেন গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম গবেষণার দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্ম-ব্যবস্থা দান করিতেছেন। পরবর্ত্তী দ্বারে গওছুল আ'জম হজরত আবদুল কাদের জিলানী অথবা খাজা বহাউদ্দীন যেন আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তার করিতেছেন। অন্য আর এক দ্বারে হাদিছ-শাস্ত্র বিশারদ হজরত আবু হোরেরা যেন পবিত্র হাদিছের অধ্যাপনা করিতেছেন। সর্ব্বশেষ দ্বারে দার্শনিক-প্রবর মওলানা জালালুদ্দীন রুমী বা শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার যেন দর্শন ব্যাখা করিতেছেন।" অন্য কথায় একাধারে এত বিভিন্ন গুণের সমাবেশ অন্য কোন বরেণ্য পুরুষের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। কোন মহাপুরুষ ব্যক্তিগতভাবে এক সঙ্গে জগতের সভ্যতাকে এত বেশী দান করিতে পারেন নাই। শাহ্ ছাহেব বিভিন্ন জগৎ-বরেণ্য পুরুষের সহিত হজরত ওমরের তুলনা করিয়াছেন, শুধু অলঙ্কার শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার খাতিরে। বাস্তবিক পক্ষে ওমর ফারুকের স্থান তাঁহাদের বহু উপরে।

ফারুক-চরিতের বিশেষত্ব

আল্লার শেষ-নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ওমর ফারুককে ছনদ দিতেছেন :—

لو كان بعدي نبي لكان عمر بن خطاب

অনুবাদ :—"আমার পরে যদি নবী হওয়ার বিধান থাকিত, নিশ্চয় ওমর বিন্ খাত্তাবই নবী হইতেন।"

হজরত ওমর ফারুক ব্যতীত অন্য কোন ছাহাবীর পক্ষে এই গৌরব-জনক ছনদ লাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই।

এতদ্ব্যতীত ফারুকের জীবন-বৃত্তান্তে আর একটী বিশেষত্ব আছে তাঁহার সরল জীবন যাপনে। আজ জ্ঞানী ইতিহাস-বেত্তাগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, জয় পরাজয় বা বড় বড় কর্ত্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়া মানুষের প্রকৃত পরিচয় হয় না। তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র কার্য্যাবলীতে। মধ্য যুগের পূর্ব্বতন বীর ও মহাপুরুষগণের জীবনেতিহাস অনুমানের উপর নির্ভর করে। সভ্যতার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বীরদিগের সমাজগত জীবন ব্যতীত ব্যক্তিগত জীবনের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। তারপর অতিরঞ্জনের স্তূপ হইতে তাঁহাদের জীবনী-সার-সঙ্কলন এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পরন্তু হজরত ওমর ফারুকের জীবন-বৃত্তান্তে এবম্প্রকারের কোন দোষ ত্রুটি নাই। ইতিহাসের জন্মদাতা আরব-মোছলমানগণ ফারুকের সরল জীবনের সত্য ঘটনাগুলি যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে অতিরঞ্জন আদৌ স্থান পায় নাই।

প্রাথমিক-জীবন ও বংশ-পরিচয়



(ওমর বিন্ খত্তাব, বিন্ নোফায়ল, বিন্ আবদুল ওজ্জা, বিন্ রোব্বাহ্, বিন্ আবদুল্লাহ্, বিন্ কোর‍্ৎ, বিন্ রজ্জাহ্, বিন্ আদী, বিন্ কা'ব, বিন্ লোই, বিন্ গালেব, বিন্ ফাহ্‌র, বিন্ মালেক্)। (১)

আরবগণ সাধারণতঃ আদ্‌নান ও কাহ্‌তানের বংশধর। আদ্‌নান এব্‌রাহিম নবীর পুত্র হজরত এছমাইলের বংশ-সম্ভূত। আদ্‌নানের পরবর্ত্তী একাদশ পুরুষে ফাহ্‌র্ বিন মালেক নামে একজন সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ কোরেশ নামে অভিহিত হয়। এই কোরেশ বংশে এক সময়ে হাশেম, উম্মিয়া, নৌফল্, আবদুদ্দার, আছদ, তীম, মখ্‌জুম, আদী, জমাহ্ ও ছমাহ্ এই দশজন বিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন। মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা হাশেমের এবং খলিফা ওমর আদী বংশে জন্মলাভ করেন।

ধন-সম্পদ ও সম্মান-প্রতিপত্তিতে তদানীন্তন আরবদিগের মধ্যে কোরেশগণই প্রধান ছিল। অধিকন্তু কা'বা গৃহের সেবায়েৎ হিসাবে তাহারা সমগ্র আরবের আচার্য্য বা ধর্ম্মগুরুর পদমর্য্যাদাও লাভ করিয়াছিল। এই প্রাধান্য হেতু, কোরেশ বংশের ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্র

---

(১) ابن قتيبه

বিষয়ক বহু কর্ত্তব্য ছিল। কোরেশদিগের বংশগত কর্ত্তব্যসমূহ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত এক এক জন উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইতেন। (১)

ওমর ফারুকের পূর্ব্বপুরুষ আদী রাজদূত ও বিচারকের কাজ করিতেন। আরবের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা প্রধানদিগের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হইলে, তিনি মধ্যস্থতা করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও বাক্‌শক্তিই এই পদে নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইত। নির্ব্বাচিত হইয়া বংশ-পরম্পরা-ক্রমে আদীর সন্তানগণই এই কার্য্য সমাধা করিতেছিলেন। ওমরের পিতামহ নোফায়ল এই কার্য্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নোফায়লের আমর ও খত্তাব নামে দুই পুত্র-সন্তান ছিল। খত্তাব বড় উদ্ধত স্বভাবের ছিলেন।

ওমরের পিতার নাম খত্তাব বিন্ নোফায়ল। মাতার নাম হান্তমা। হান্তমার পিতামহ মুগীরা কোরেশ বংশের একজন সম্ভ্রান্ত ও যুদ্ধ-বিশারদ লোক ছিলেন।

হিজরী সনের ৪০ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে হজরত ওমরের জন্ম হয়। তাঁহার শৈশব, বাল্যজীবন ও যৌবনের প্রথম ভাগ, অন্য কথায় এছলাম গ্রহণের পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে ইতিহাসে বিশেষ কিছু লেখে নাই। এই মাত্র উল্লেখ আছে যে,—মক্কার অনতিদূরে জজ্‌নানের ময়দানে পিতা খত্তাব বালক ওমরকে উষ্ট্র চরাইবার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর যৌবনে পদার্পণ করিয়া ওমর আরব দেশের প্রথানুসারে, কুলশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং যুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, বক্তৃতাদি শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এতৎসঙ্গে তাঁহার বর্ণ পরিচয়ও ঘটিয়াছিল। তিনি লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন। ওমর মল্লযুদ্ধ

(১) عقد الفريد باب فضائل العرب

ও অশ্বধাবনে সবিশেষ পটু ছিলেন। আরাফাতের ময়দানের নিকট বৎসর বৎসর ওকাজ নামে এক মেলা বসিত। এই মেলায় আরবের শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আপন আপন বিদ্যা-কৌশল ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতেন—কবিগণ কবিতা লেখিয়া, বক্তাগণ বক্তৃতা করিয়া আর যোদ্ধৃগণ যুদ্ধ কৌশল দেখাইয়া। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, ওকাজের দঙ্গলে মল্ল-যুদ্ধ করিয়া, ওমর যশস্বী হইয়াছিলেন। ওমর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন বাগ্মী ছিলেন।

আরবের ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত সন্তানোচিত শিক্ষা অর্জ্জন করতঃ ওমর আপন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত বাণিজ্যই আরবদিগের প্রধান ও প্রশস্ত অবলম্বন। তিনিও বাণিজ্য-ব্যবসায়কে জীবিকার্জ্জনের অবলম্বন করিয়া লইলেন। বাণিজ্য ব্যপদেশে তিনি দেশ-বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পাইলেন। প্রবল অনুসন্ধিৎসার ফলে নানা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন পূর্ব্বক তিনি উন্নতমনা, উচ্চাভিলাষী ও আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন; আরবময় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বিশিষ্ট আরব-প্রধানদিগের মধ্যে গণ্য হইলেন। কালে তিনি রাজদূতের পদলাভ করেন। হজরত ওমরের এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অতীব শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী। আল্লামা মছউদী বলেন, "ওমর বিন খত্তাবের অন্ধকার-যুগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বহু তথ্যে পরিপূর্ণ। তাহাতে আরব ও আজমের রাজা ও প্রকৃতিপুঞ্জ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। আমি স্বরচিত "আখ্‌বারুজ্জমান ও কেতাবুল আওছৎ" পুস্তকে তার সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি।" (১) গভীর পরিতাপের বিষয়, আজ আল্লামার এই অমূল্য গ্রন্থ নায়াব হইয়া গিয়াছে। অন্য কোন পুস্তকেও এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই।

(১) مروج الذهب

একদা খেলাফৎ-কালে হজরত ওমর এই জজ্‌নানের ময়দান অতিক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার স্মৃতিফলকে অতীতের সমস্ত কথা স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়া উঠে। দরদর ধারে চক্ষু দিয়া অশ্রু-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সে একদিন, আজ আর একদিন! উষ্ট্রের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া এই ময়দানের কোথায়ও যদি ক্ষণিকের জন্য বসিয়া পড়িতাম, বাপের বেত্রাঘাতে তখন আমাকে জর্জ্জরিত হইতে হইত।" (১)

(১) طبقات بن سعد

এছলামে আত্মসমর্পণ

এছলামের শুভ আবির্ভাবের পূর্ব্বে ধর্ম্ম, সভ্যতা ও মানব-চরিত্রের দিক্ দিয়া, জগতের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। সেই অন্ধকার-যুগে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই পাপ, দুর্নীতি, অবিশ্বাস ও অন্ধ বিশ্বাস বিরাজ করিত। মানুষের জ্ঞান, বিবেক ও ন্যায়বিচার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল। মানুষ নানা অনাচার, কদাচার ও অত্যাচারের সৃষ্টি করিয়া আপন জীবনকে অভিশপ্ত ও কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। অন্য কথায় মানুষ মনুষ্যত্ব বা মানব-চরিত্র হারাইয়া ঘোর হেয় ও ঘৃণ্য জীবন অতিবাহিত করিতেছিল। এবরাহিম নবীর সত্য ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া আরবগণ নিজেরা মূর্ত্তি গড়িয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা এবং সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের বিধায়ক ভাবিয়া তাহারই পূজা করিতেছিল। যে নগণ্য সংখ্যক লোক মূর্ত্তি-পূজার বিরোধী ছিল, তাহারা নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতিত হইত।

মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার নবুয়ৎ প্রাপ্তির পূর্ব্বে জায়দ বিন্ আমর একত্ববাদের মহিমা প্রচার করিতে গিয়া আপন পিতৃব্য খত্তাব্ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত ও স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

বিশ্বাসের প্রবল অনুরাগ তাঁহাকে স্বদেশ-ত্যাগে বিন্দুমাত্র ক্লেশ দিতে পারে নাই। তিনি মক্কা মোয়াজ্জমা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হারা অঞ্চলে চলিয়া

গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুহূর্ত্তের তরেও খানায় কা'বাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে গোপনে আসিয়া তিনি কা'বা শরীফের জেয়ারত করিয়া যাইতেন। সেই অন্ধকার-যুগে জায়দের স্বাধীন চিন্তা, তওহিদের প্রতি গভীর অনুরক্তি এবং তওহিদ-মহিমার প্রবল অনুভূতির পরিচয় তাঁহার রচিত কবিতায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। মনের আবেগে জায়দ গাহিয়াছেন—

اربا واحدا ام الف رب   ادين اذا تقسمت الامور
تركت اللات والعزى جميعا   كذلك يفعل الرجل البصير

"এক খোদার পূজা করিব না, হাজার দেব দেবীর? আমিত লাৎ, ওজ্জা প্রভৃতি দেব দেবীর পূজা পরিত্যাগ করিয়াছি। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই এরূপ করিবেন।"

পিতৃগুণে বিভূষিত হইয়া উদ্ধত যুবক ওমর যখন ২৭ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন তখন আরব-গগনে এছলাম রবি উদিত হয়। এছলাম রবির উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া আরবের অন্ধকার দূর করিতে লাগিল। শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সনাতন এছলাম প্রচারে ব্রতী হইলেন। আরবের কেন্দ্রে কেন্দ্রে এছলামের প্রচার ও বিস্তৃতি আরম্ভ হইল। উম্মুল মোমেনীন বিবী খোদেজা, হজরত আবু বকর ছিদ্দিক প্রমুখ ৪০ জন সত্যসন্ধ পবিত্র এছলাম গ্রহণ করিলেন। ওমর নব-দীক্ষিত মোছলেমদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার ও উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিলেন। অবশেষে আপন পরিবারের দাসী লবিনা এছলামে দীক্ষিত হইলে তিনি একেবারে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িলেন। ওমর ছলে বলে লবিনাকে ধর্ম্মচ্যুত করিবার প্রায়াসী হইলেন। ভীষণ প্রহার করিয়াও দেখিলেন, লবিনা এছলাম ত্যাগ করেন না। বিফল ও ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া,

এছলামের অপরাপর শত্রুগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ স্থির হইল,—এছলামের যিনি প্রবর্ত্তক স্বয়ং তাঁহারই শিরশ্ছেদ করিয়া সমস্ত রাগ, রোষ ও ক্ষোভের তৃপ্তি সাধন করিবেন—সমস্ত লেঠা চুকাইয়া ফেলিবেন।

ওমর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইলেন। ত্রাণকর্ত্তা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার বধ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ওমর তাঁহারই দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় পথে নঈমের সহিত সাক্ষাত হইল। কথোপকথনে নঈম ওমরকে জানাইলেন,—তদীয়া সহোদরা ফাতেমা এবং ভগ্নীপতি ছঈদ উভয়ই এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া ওমর ক্রোধে অধীর হইলেন এবং তন্মুহূর্ত্তে ভগিনীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ফাতেমা কোরআন পাঠ করিতেছিলেন। ওমর আসিতেছেন দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তিনি কোরআন পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু কোরআন পাঠের সেই অমিয়-মাখা সুর গিয়া অস্পষ্ট ভাবে পূর্ব্বেই ওমরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং ছঈদ ও ফাতেমার নিকট উপস্থিত হইবা মাত্র, ওমর ভীতি-ব্যঞ্জক-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"তোমরা কি পড়িতেছিলে ?"

উত্তর হইল,—"কিছুই না।"

উত্তর শুনিয়া ওমর ক্রোধে অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। "পাপিষ্ঠ নরাধম! ধর্ম্মচ্যুত (?) হইয়া গিয়াছ" এই বলিয়া ভগ্নীপতি নিরীহ ছঈদকে ভীষণভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। স্বামীর উদ্ধারের নিমিত্ত ফাতেমা অগ্রসর হইলে, তিনিও স্বামীর দশা প্রাপ্ত হইলেন। শরীর ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া গেল। ফাতেমার মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইল,—"ওমর! এছলাম হৃদয়ের বস্তু—হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। যতই কেন প্রহার কর, এছলাম ত্যাগ করিতে পারিব না।" অবলা দুর্ব্বলা নির্য্যাতিতা ভগিনীর মুখে

এইরূপ তেজোপূর্ণ কথা শ্রবণ মাত্রই ওমরের হৃদয় স্নেহ ও করুণায় দ্রবীভূত হইল। তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসার তীব্র তাড়না তাঁহার হৃদয়কে আঘাত করিতে লাগিল। ভগিনীর গোচর করিলেন,—"ভগিনি! তুমি যাহা পড়িতেছিলে, তাহা আমায় একবার পড়িয়া শুনাও।" ফাতেমা অবিলম্বে কোরআনের সেই পবিত্র শ্লোক সমূহ ওমরের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। ওমর পড়িতে লাগিলেন,—

سبح لله ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم الخ

ভূগোলে খগোলে চেতন অচেতন যাহা কিছু আছে, সবই আল্লার গুণবাদ ও পবিত্রতা কীর্ত্তন করে। এবং তিনি মহান ও মহাতত্ত্বজ্ঞানী। ....পড়িতে পড়িতে তাঁহার মন কোমল হইতে লাগিল। জ্ঞানের উন্মেষ আরম্ভ হইল। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের অন্ধকার ও আবর্জ্জনা-রাশি দূরীভূত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার দৃষ্টি যখন امنو بالله ورسوله (আল্লাহ্ ও আল্লার রছুলের প্রতি বিশ্বাস কর) এই আয়াতের উপর পতিত হইল, তখন ভক্তি-গদ্‌গদ-কণ্ঠে ওমর বলিয়া উঠিলেন,—

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله

"আল্লাহ ভিন্ন উপাস্য নাই—তিনিই সর্ব্ব-জগৎ-স্বামী এবং মোহাম্মদ তাঁহারই প্রেরিত, এই সত্য আমি স্বীকার করিয়া লইলাম।

রছুলে করিম এই সময়ে ছাহবীগণ সহ ছফা পর্ব্বতের পাদদেশে আরকমের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। ওমর আরকমের গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া হজরতের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ওমরকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দেখিয়া কোন কোন ছাহাবী চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া

উঠিলেন। কিন্তু বীরবর হজরত হামজা দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—"ভয় নাই। সরল ভাবে আসিয়া থাকে ত ভালই। অন্যথায় তাহার তরবারি দিয়া তাহাকেই নিঃশেষ করিয়া দিব।" ইতিমধ্যে রছুলে করিম সম্মুখে অগ্রসর হইয়া স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওমর, কি মনে করিয়া?"

বিনয়াবনতভাবে ভক্তিপূর্ণকণ্ঠে ওমর উত্তর করিলেন,—"ঈমান আনিব"

উত্তর শুনিয়া হজরত নবী করিম 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি করিলেন। উপস্থিত ছাহাবীগণ পবিত্র কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া এত উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি করিলেন যে, 'ছফা' পর্ব্বত মুখরিত হইয়া উঠিল। (১)

آمد آن یارے کہ ما می خواستیم

হজরত ওমরের এছলামে আত্মসমর্পণ করার পর, এছলামের ইতিহাসে নব যুগের সৃষ্টি হইল। মোছলমানদিগের মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার হইল—এযাবৎ প্রায় ৫০ জন আরব এছলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। হজরত হামজা প্রমুখ বীরগণ এছলাম কবুল করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা এছলামের কর্ম্ম-ক্রিয়া প্রকাশ্যে সম্পাদন করিতে পারিতেন না। মোছলমানগণ কা'বা গৃহে নমাজ সমাপন করিবার অধিকারী ছিলেন না। হজরত ওমরের দীক্ষার পর তৎকালীন মোছলমানদিগের সাহস বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া গেল। এমন কি কাফের কোরেশদিগের সহিত সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইতেও তাঁহারা দ্বিধা বোধ করিতেন না। তাঁহারা সদলবলে কা'বা গৃহে যাইয়া নমাজ সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

[১] کامل و اسد الغابہ

হিজরৎ



বিধর্ম্মী কোরেশগণ প্রথমতঃ কোরআন ও তাহার মহিমাময় বাহক এবং তাঁহার প্রচারিত সত্য ধর্ম্মকে উপহাস ও বিদ্রূপ দ্বারাই পরাভূত করিবার চেষ্টা করিল। পরে এছলামের বিস্তৃতি দেখিয়া তাহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তখন তাহারা পাশবিক বলের আশ্রয় লইল। তথাপি যতদিন পিতৃব্য আবু তালেব জীবিত ছিলেন, ততদিন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা বা তাঁহার সহচরদের প্রতি কেহ প্রকাশ্য অত্যাচার করিতে সাহসী হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর কাফের কোরেশগণ নির্ম্মম ও নৃশংস অত্যাচার আরম্ভ করিল। সেই অত্যাচার ও নির্য্যাতনের নিদারুণ কাহিনী বর্ণনাতীত, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু সেই ভীষণ পাশবিক অত্যাচারে কখনও কোন মোছলমানের পদস্খলন হয় নাই।

ইতিমধ্যে মদিনায় এছলাম বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সেখানকার নবদীক্ষিত মোছলেমগণের দল বেশ পুষ্ট ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

যে সকল মোছলমানের পক্ষে শত্রুর পাশবিক উপদ্রবের হাত এড়াইবার কোন উপায় ছিল না এবং মক্কায় অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, রছুলে আকরম তাঁহাদিগকে মদিনায় হিজরৎ করিবার আদেশ করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে আবু ছলমা তারপর হজরত বেলাল আরও দুইজন

মোছলমান সহ মদিনা গমন করিলেন। পরে হজরত ওমর ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের খাতিরে পার্থিব সমস্ত সম্মান-প্রতিপত্তি ও স্বদেশ-প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া বেলালের অনুসরণ করিলেন। হজরত ওমরের সমভিব্যহারে আরও বিশ জন মোহাজের ছিলেন।

মদিনায় পঁহুছিয়া মোহাজেরগণ দুইদলে বিভক্ত হইলেন। একদল খাস মদিনায়, আর একদল মদিনার অদূরবর্ত্তী 'কবা' নামক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স্বয়ং ৬২৩ খৃষ্টাব্দে মদিনায় গমন করিলেন। আ'ফ্‌তাবে রেছালৎ মদিনার আকাশে গিয়া উদিত হইল।

নিঃসহায় ও নিঃসম্বল মোহাজেরদিগের সহিত মদিনার আন্‌ছারগণ যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, যে ভ্রাতৃভাব দেখাইয়াছেন, যে বদান্যতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত নাই। এক একজন আন্‌ছার এক একজন মোহাজেরকে পরমার্থ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করিলেন। ভ্রাতা আন্‌ছার তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিকে দুই সমানভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশ ভ্রাতা মোহাজেরকে দান করিলেন।

এই ভ্রাতৃসম্বন্ধনে হজরত রছুল আকরম উভয় দিকের মান-সম্মান ও ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ওমর ফারুক যে মহানুভব আন্‌ছারের সহিত ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি ওৎবান বিন্‌ মালেক। ইনি ছালেম বংশের প্রধান ছিলেন।

ছাহাবী-জীবন



হিজরৎ হইতে অফাতে রছুল পর্য্যন্ত শিষ্য ও সহচররূপে ওমর ফারুক প্রায় সকল কার্য্যে রছুলে করিমের সহায়তা ও সাহচার্য্য করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে, পুস্তকের এই অংশ হজরতের জীবনীতে পরিণত হইবে। সুতরাং এস্থলে সংক্ষেপে কয়েকটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিব, যাহার সহিত হজরত ওমরের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে।

মক্কা মোয়াজ্জমা ত্যাগ করিয়া নবী করিম খাস মদিনায় আর ওমর ফারুক অদূর 'কবা' নামক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হজরত ওমর একদিন অন্তর একদিন করিয়া মদিনায় রছুলুল্লার খেদমতে হাজির থাকিতেন। আকা মোস্তফার চরণতলে ব'সিয়া সারাদিন ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিতেন। যেদিন তিনি উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না, সেইদিন তাঁহার এছলামী ভ্রাতা ওৎবান আসিয়া রছুলে মক্‌বুলের উপদেশ-বাণী শুনিয়া যাইতেন। গৃহে ফিরিয়া সেই সকল উপদেশ যথাযথ-ভাবে হজরত ওমরের গোচর করিতেন।

মদিনায় গিয়া হজরত ঈদ, জুম্‌আর নমাজ, জাকা'ত প্রভৃতি অনুষ্ঠান গুলির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে নমাজের সময় ঘোষণা করিবার কোন নিয়ম ছিল না। অনেক ছাহাবী খৃষ্টান গির্জ্জার

ন্যায় ঘণ্টা-ধ্বনির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু হজরত ওমরের তাহা পছন্দ হইল না। তিনি লোক নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন; যিনি উচ্চ কণ্ঠে নমাজের সময়-ঘোষণা করিবেন। রছুলুল্লাহ্ ইহাই সমর্থন করিলেন—হজরত বেলালকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই নিয়ম আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। যতদিন পৃথিবী আছে ততদিন থাকিবে। আজানের সুমধুর ধ্বনির সহিত হজরত ওমরের নামও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বদরের যুদ্ধ

কাফের কোরেশদিগের অত্যাচারে হজরত স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মদিনায় প্রস্থান করিলেন সত্য; কিন্তু ইহাতে তাহাদের হিংসা-বৃত্তির নিবৃত্তি হইল না। তাহারা মদিনার উপর আক্রমণের পর আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে হিজরী দ্বিতীয় সালে মোতাবেক খৃষ্টীয় ৬২৪ অব্দে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

কোরেশ-প্রধান আবু ছুফিয়ান বাণিজ্যোপলক্ষে সিরিয়া গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে মোছলমানদিগের আক্রমণ সম্বন্ধে এক ভিত্তিহীন গুজব শুনিতে পাইলেন। গুজবের সংবাদ মক্কায় পঁহুছিলে, কোরেশগণ আপনাদের বিখ্যাত বীরগণ সমভিব্যহারে ৭৫০ যোদ্ধার এক বাহিনী লইয়া মদিনার দিকে অগ্রসর হইল। সংবাদ পাইয়া হজরত ৩১৩ জন মোছলেম সহ আত্মরক্ষা ও শত্রুর গতিরোধ করিতে বহির্গত হইলেন। ছয় মঞ্জিল অতিক্রম করিয়া, বদর ক্ষেত্রে শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হইলে, ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে কোরেশদিগের পরাজয় হইল। ৭০ জন শত্রু নিহত, বহু লোক আহত ও বন্দী হইল। এছলামের জাত-শত্রু আবু জেহেল ও বড় বড় কোরেশ-বীর এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। মোছলেম বাহিনীতে ছয়জন মোহাজের ও আটজন আন্ছার শহীদ হইয়াছিলেন।

তদনন্তর মোছলমানদিগের এক সভা বসিল। যুদ্ধ-বন্দিগণ সম্বন্ধে কি করা উচিত, তাহা লইয়া সভায় মতভেদ উপস্থিত হইল। হজরত ওমর বন্দিদিগকে প্রাণে বধ করিবার পরামর্শ দিলেন। "এছলামের তুলনায় আত্মীয় স্বজনের মায়া অতি তুচ্ছ। এছলামের খাতিরে তাহাদিগকে বধ করাই সঙ্গত। অতএব আলী সহোদর আকিলকে, হামজা সহোদর আব্বাছকে বধ করুক। আমার যে সকল আত্মীয় স্বজন ইহাদের মধ্যে আছে আমি তাহাদের প্রাণ সংহার করিব।" (১) কিন্তু হজরত আবু বকর ছিদ্দিক মুক্তি-পণ লইয়া ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। দয়ার সাগর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার ইহাই পছন্দ হইল। তিনি মুক্তি-পণ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। (রমজান, হিজরী ২য় সাল।)

যুদ্ধায়োজনে হজরত ওমর বিশেষ তৎপরতা দেখাইয়াছেন। সাক্ষাত সমর-ক্ষেত্রেও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই যুদ্ধে ওমর ফারুক কর্ত্তৃক তাঁহার আপন মাতুল আ'ছী নিহত হন।

ওহুদের যুদ্ধ।

বদরের যুদ্ধে মোছলমানদিগের জয় হইল বটে; কিন্তু ইহাতে নূতন নূতন সংগ্রামের সূচনা হইল। এতদিন মদিনার এহুদীগণ মোছলমানদিগের সন্ধিবদ্ধ মিত্র ছিল। এহুদীগণ অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল,—তাহারা কখনও এছলামের শত্রুদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করিবে না। মদিনা আক্রান্ত হইলে, উভয় সম্প্রদায় তাহাদের সম্মিলিত শক্তি লইয়া উহার রক্ষা করিবে। মদিনাবাসী এহুদীগণ স্বদেশ রক্ষার জন্য এরূপ শর্ত্তে মোছলমানদিগের সহিত সন্ধিবদ্ধ ছিল। কিন্তু মোছলমানদিগের শক্তি ও শৌর্য্য

(১) طبری

দেখিয়া তাহারা চমকিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। অন্যদিকে কোরেশদিগের প্রতিহিংসার ভীষণ দাবানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কোরেশ-প্রধান আবু ছুফিয়ান পণ করিলেন, যতদিন বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে না পারিবেন, ততদিন অবগাহনাদি কার্য্য করিবেন না। আবু ছুফিয়ান স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষ এবং আবুজেহলের পুত্র একরামা ও খালেদ বিন অলিদ নায়ক হইলেন। তিন সহস্র সৈন্যের বিপুল বাহিনী মদিনা আক্রমণে অভিযান করিল।

সংবাদ পাইয়া কিংকর্ত্তব্য নিদ্ধারণ কল্পে মোছলমানদিগের পরামর্শ সভা আহুত হইল। সভায় মতভেদ ঘটিল। হজরতের অভিপ্রায় ছিল, মদিনায় থাকিয়া আত্মরক্ষা করা। অনেক বাদানুবাদের পর যুবক ছাহাবী-গণেরই মত প্রবল হইল। তাঁহাদের মতে মদিনার বাহিরে গিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করাই বিধেয়। তদনুসারে ৭০০ জন সৈন্য সহ হজরত মদিনা ত্যাগ করিলেন। মদিনার তিন মাইল দূরে ওহদ পর্ব্বতের পাদদেশে হিজরী দ্বিতীয় সালের ৭ই শাওয়াল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ইতিমধ্যে বিজয়োন্মত্ত মোছলেম-সৈন্যগণ 'গণিমতে'র প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগকে অন্যমনস্ক দেখিয়া শত্রু-সৈন্য আচম্বিতে পুনরাক্রমণ করে। মোছলেম-সৈন্যগণ প্রতিরোধে অসমর্থ হইলেন। নূরনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে লক্ষ্য করিয়া অরাতিগণ তীর ও লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। লোষ্ট্রের আঘাতে হজরতের দন্দান মোবারক শহীদ হইয়া গেল। সুপবিত্র কপাল-দেশ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তস্রাব আরম্ভ হইল। হজরত মূর্চ্ছাগত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। মোছলেম-সৈন্যগণ হজরতের জীবন সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া অতিশয় শোকাতুর ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। একদল সৈন্য হজরতকে পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করাইল। শত্রুসৈন্য পশ্চাতে ছুটিল। তখন একান্ত

বিক্রমের সহিত লড়িয়া হজরত ওমর শত্রু-সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন।

অতঃপর আবু ছুফিয়ান আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"এ দলে মোহাম্মদ (দঃ) আছেন?" রছুলুল্লাহ্ ছাহাবীদিগকে জওয়াব দিতে নিষেধ করিলেন। তারপর আবু ছুফিয়ান হজরত ওমর ও হজরত আবু বকরের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তাহারা নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে।" তখন হজরত ওমর সিংহ-বিক্রমে বলিয়া উঠিলেন—"রে আল্লার শত্রু! আমরা সকলেই জীবিত আছি।" আবু ছুফিয়ান আর সেই পর্ব্বত শিখরে আক্রমণ করিবার সাহস করেন নাই। (১)

খন্দকের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের পর মদিনার মিত্র এহুদীগণ ঘোর শত্রুতাচরণ করিতে লাগিল। এমন কি ত্রাণকর্ত্তা হজরত মোস্তফার প্রাণ সংহারের চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। কাপুরুষ আমর বিন্ হজ্জাশ গোপনে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হজরতের প্রাণ বধের চেষ্টা করিল। অবশেষে এহুদী বনু নদীর বংশের সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহারা খায়বরে প্রস্থান করিল। খায়বরে পঁহুছিয়া পুনরায় যুদ্ধায়োজনে লিপ্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মক্কার কোরেশদিগকেও উস্কাইয়া তুলিল। উভয়ে একযোগে সৈন্য সংগ্রহ করিল। ৫ম হিজরী শওয়াল মাসে দশ সহস্র সৈন্যের বিশাল বাহিনী লইয়া আবু ছুফিয়ান মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মোছলমানগণ মদিনার বহির্ভাগে ছলা' পর্ব্বতের অপর পারে খন্দক বা পরিখা খনন করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিয়া দিলেন। এরূপ পরিখা খনন আরবদিগের নিকট

---

(১) ابن هشام

সম্পূর্ণ অভিনব ও অজ্ঞাত ছিল। অতএব শত্রু-সৈন্য পরিখা অতিক্রম করিবার সাহস করিল না; একমাস কাল পরিখা বেষ্টন করিয়া থাকিয়া মোছলমানদিগের রসদ-পত্র বন্ধ করিয়া দিল।

পরিখা পরিদর্শনের ভার হজরত ওমর, হজরত আলী প্রমুখ বড় বড় বীর-ছাহাবীর উপর ন্যস্ত ছিল। যে অংশ হজরত ওমরের তত্ত্বাবধানে ছিল, সেই অংশে একদল শত্রু-সৈন্য পরিখা অতিক্রম করিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। কিছুক্ষণ বল পরীক্ষার পর শত্রু-সৈন্য পলায়ন করিল। এই স্থানে এখনও ওমরের নামানুসারে একটি মছজেদ বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহারই বীরত্ব ও দৃঢ়তার জয় ঘোষণা করিতেছে। (১)

আমর বিন্ আবদুদ নামে আরবের বিখ্যাত কাফের বীর, হজরত আলী কর্ত্তৃক এই যুদ্ধে নিহত হয়।

অবশেষে কাফের-কোরেশ ও এহুদীদিগের মধ্যে আত্মকলহ আরম্ভ হয়। সেই আত্মকলহের ফলে তাহারা অবরোধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

(১) ازالة الخفاء

হোদায়বিয়ার সন্ধি



হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা মক্কা পরিত্যাগ করার পর একে একে পাঁচ বৎসর অতীত হইল। মোহাজের ছাহাবীগণ জন্মভূমি মক্কা ও পবিত্র গৃহ কা'বা দর্শনের জন্য ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। হিজরী ৬ষ্ঠ অব্দে হজরত কা'বা মন্দির দর্শনের নিমিত্ত মক্কাধামে যাইবেন, স্থির করিলেন। ছাহাবীদিগকে নিরস্ত্র যাত্রার আদেশ করিলেন। কারণ, পাছে কাফের কোরেশগণ এই তীর্থযাত্রাকে সমরাভিযান মনে করে।

ছাহাবীগণসহ হজরত মদিনা ত্যাগ করিলেন। ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া জুল-হুলিফা নামক স্থানে উপনীত হইলেন। ওমর ফারুক হজরতের সমীপে আসিয়া আবেদন করিলেন,—নিরস্ত্র যাওয়া অসমীচীন,—সম্ভবতঃ নিরাপদও নহে। হজরত ওমরের নিবেদনানুসারে মদিনা হইতে অস্ত্রশস্ত্র আনীত হইল।

মক্কায় পঁহুছিতে আর দুই মঞ্জিল বাকী আছে, এমন সময় বশর বিন ছুফিয়ান আসিয়া খবর দিল যে, কোরেশগণ মোছলমানদিগের মক্কা গমনের সংবাদে বিষম উত্তেজিত হইয়াছে। তাহারা কখনও মোছলমানদিগকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না।

হজরত ওছমান মোছলেম দূতরূপে মক্কায় প্রেরিত হইলেন। দূত গিয়া কোরেশ প্রধানকে জানাইলেন, যুদ্ধ মোছলমানদিগের অভিপ্রেত নহে, পবিত্র কা'বা মন্দিরের জেয়ারত মাত্র তাঁহাদের উদ্দেশ্য। যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা তাঁহাদের সেই পবিত্র উদ্দেশ্যে বিঘ্ন জন্মিতে পারে। সুতরাং তাঁহারা তাহা পছন্দ করেন না। অতএব মোছলমানদিগের মক্কা আগমনে কোরেশদিগের ভয়, শঙ্কা বা চাঞ্চল্যের কোন হেতু নাই।

দূত ওছমান একান্ত যোগ্যতার সহিত আপনাদের উদ্দেশ্য কোরেশ-দিগের গোচর করিলেন। কিন্তু বিধর্ম্মী কোরেশগণ প্রতিহিংসায় এতদুর হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল যে, নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় তাহারা মোছলেম দূত হজরত ওছমানকে বন্দী করিয়া রাখিল। এদিকে মোছল-মানগণ দূতের আগমন প্রতীক্ষায় অধীর ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আবার কয়েকদিন পরে মোছলেম শিবিরে গুজব রটিল, দূত ওছমান শত্রু কর্তৃক শহীদ হইয়াছেন।

এই সংবাদ পাইয়া, রছুলে করিম যুদ্ধের বায়াত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ১৪০০ জন ছাহাবী যুদ্ধে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত ও প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলেন। ওমর ফারুক এই বায়াত গ্রহণের পূর্ব্বেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। যখন জানিতে পারিলেন যে, আকা মোস্তাফা জেহাদের বায়াত গ্রহণ করিতেছেন, তখন তৎমুহূর্ত্তেই হজরত ওমর আসিয়া বায়াত করিলেন। এক বৃক্ষতলে বায়াৎ গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া, এই ব্যাপার বায়াতুশ্‌শজরা (بيعة الشجرة) নামে পরিচিত।

কোরেশগণ জেদ্ ধরিল, তাহারা কখনও হজরতকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। বাক্ বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। অবশেষে নিম্ন শর্ত্ত অনুযায়ী সন্ধি স্থাপিত হইল।

শর্ত্তসমূহ ঃ—

(১) এই বৎসর মোছলমানগণ মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

(২) পরবর্ত্তী বৎসর কা'বার জেয়ারৎ করিতে পারিবেন বটে; কিন্তু তিন দিনের বেশী মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবেন না।

(৩) দশ বৎসর কাল এই সন্ধি বলবৎ থাকিবে।

(৪) ইতিমধ্যে কোন কোরেশ মোছলেমদিগের আশ্রয় চাহিলে তাঁহারা তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিবেন না। কিন্তু কোরেশগণ মোছলমানদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যে কোন মোছলমানকে আশ্রয় দিতে পারিবে। এমন কি কোন মোছলেম তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িলে তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া না দেওয়া কোরেশদিগের ইচ্ছাধীন।

(৫) আরবের বিভিন্ন বংশ কোরেশ বা মোছলেমদিগের সহিত স্বাধীনভাবে সন্ধি বদ্ধ হইতে পারিবে।

প্রাগুক্ত শর্ত্তসমূহ স্থির হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধি-পত্র লিখিত হইবে। এমন সময়ে হজরত ওমর ক্ষুণ্ণমনে ও চঞ্চলভাবে হজরত আবুবকর ছিদ্দিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ অপমানজনক সন্ধির প্রয়োজন কি? ভক্ত ছিদ্দিক বলিলেন, আল্লার রছুল যাহা করিতেছেন, তাহা শুভ ও মঙ্গলপ্রদ। সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া হজরত ওমর স্বয়ং হজরতের সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর উভয়ের মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হয়।

ফারুক—আপনি কি আল্লার রছুল নহেন?

হজরত—আমি আল্লার রছুল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ফারুক—আমাদের শত্রুগণ মোশ্‌রেক নহে কি?

হজরত—নিশ্চয়, তাহারা মোশ্‌রেক।

ফারুক—সত্যধর্ম্মকে অপমানিত করিবার হেতু কি?

হজরত—আমি আল্লার রছুল। আল্লার অনুজ্ঞা-বিরুদ্ধ কাজ করি না।"

শেষ উত্তর পাইয়া হজরত ওমর সন্তুষ্ট হইলেন। বুঝিতে পারিলেন, আল্লার নবী আল্লার অনুজ্ঞা মতই এরূপ সন্ধি করিতেছেন। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। বড় বড় ছাহাবীর স্বাক্ষর হইল। হজরত ওমরও দস্তখত করিলেন। কথোপকথনে তাঁহার যে দুর্ব্বিনীত ব্যবহার প্রকাশ পাইয়াছিল, তজ্জন্য হজরত ওমর বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। এমনকি সেই জন্য তিনি কফ্ফারা স্বরূপে দাস-মুক্তি ও রোজাব্রত সম্পাদন করিয়াছিলেন। (১)

সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হইলে পর, হজরত ছাহাবীগণসহ মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে হজরতের প্রতি অহি নাজেল হইল,—

انّا فتحنا لك فتحاً مبينا

"আমরা তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করিলাম।"

হিজরী ৬ষ্ঠ অব্দে মোছলেম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে কোরেশ অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে, এই সময়ে মোছলমানগণ অনায়াসে মক্কা প্রবেশ করিতে পারিতেন। তথাপি শান্তিকর্ত্তা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা যুদ্ধাপেক্ষা সন্ধিকেই প্রেয় ও শ্রেয় মনে করিলেন। প্রত্যাদেশে আল্লাহ ইহাকে প্রকাশ্য বিজয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। এই রহস্য হজরত ওমর তখন বুঝিতে পারেন নাই। অবশ্য পরে এই রহস্যের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনে সমর্থন হইয়াছেন।

ফলতঃ এছলামের ইতিহাসে যত বিজয় লাভ ঘটিয়াছে, হোদায়বিয়ার

(১) طبري

সন্ধি তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রকাশ্য। রুম-শাম ও পারশ্য-তুরস্ক বিজয়াপেক্ষাও ইহা বড়। এবং সকল বিজয়ের মূল উৎস ইহাই। এতদিন কোরেশগণের সহিত মোছলমানদের মেলামেশা করিবার কোন সুযোগ ছিল না। এছলামের সত্য, এছলামের সাম্য ও এছলামের প্রেম তাহাদের নিকট অজ্ঞাত ও অপরিচিত ছিল। এইক্ষণ মোছলমানগণ ভাব বিনিময়ে এছলামের প্রকৃত স্বরূপ মক্কাবাসী কোরেশগণের নিকট ধরিতে লাগিলেন। এছলামের সম্মোহন নীতি অবগত হইয়া দলে দলে মক্কাবাসীগণ মুক্তির একমাত্র অবলম্বন রূপে পবিত্র এছলাম কবুল করিতে লাগিল।

খায়বর যুদ্ধ

খন্দকের যুদ্ধে এহুদাগণ পরাস্ত হইল। পরাজয়ের পর তাহারা প্রতি হিংসায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। মোছলেমদিগের বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। বিভিন্ন বংশ ও গোষ্ঠীকে উস্কাইয়া আপনাদের দল পুষ্ট করিতে লাগিল। খায়বরে অনেক সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করিল। এইরূপে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিষম উৎপাত আরম্ভ করিল। বনি ছা'দ, বনি গৎফান প্রভৃতি কবিলা খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হইল।

অবশেষে হিজরী ৭ম সালে দুই শত অশ্বারোহীসহ ষোল শত সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা খায়বর অভিমুখে অভিযান করিলেন। নায়েম, কমুছ, ছা'ব দুর্গ অধিকৃত হইল। শত্রু-সৈন্য ওতীহ ও ছালেম দুর্গে সমবেত হইল। আরবের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ বীর মরহাবের অধিনায়কত্বে এহুদী সৈন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করিতে লাগিল। যথাক্রমে হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর বহু সৈন্যসহ বারম্বার আক্রমণ করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইলেন। পরদিন হজরত মহাবাহু আলীকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন। দুর্গদ্বয় অধিকৃত হইল।

মরহাব হজরত আলী কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। খায়বর ভূমি মোছলেম করতলগত হইল।

খায়বর ভূমি মোছলেম সৈন্যদিগের মধ্যে বিভক্ত হইল। ছমগ অঞ্চল হজরত ওমর পাইলেন। কিন্তু দানবীর হজরত ওমর এই সম্পত্তি নিজে ভোগ করেন নাই। ছমগ অঞ্চল তিনি ধর্ম্মার্থ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। এছলামের ইতিহাসে ইহাই সর্ব্বপ্রথম অকৃফ। (১)

(১) ابن الجوزي

মক্কা-বিজয়



হোদায়বিয়া-সন্ধির শর্ত্ত অনুসারে খজাআ কবিলা মোছলেমদিগের এবং বনু বকর কোরেশদিগের সহিত সন্ধি করিয়াছিল। হোদায়বিয়া সন্ধির পর তাহারাও পরস্পর সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিল। কিছুদিন পরে বনু বকর সন্ধি ভঙ্গ করে। কোরেশগণ মধ্যস্থতা না করিয়া অন্যায় ভাবে বনু বকরের সাহায্য করিতে লাগিল। তাহাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া খজাআ কবিলা পবিত্র হারমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু সেখানেও তিষ্ঠিতে পারে নাই। তখন নিরুপায় হইয়া দুর্ব্বল খজাআ কবিলা মোছলেমদিগের আশ্রয় ও সাহায্য ভিক্ষা করিল। চতুর আবু ছুফিয়ান এই সংবাদ পাইবামাত্র মদিনায় আসিয়া পঁহুছিলেন। প্রথমতঃ হোদায়বিয়া-সন্ধির শর্ত্ত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। কিন্তু হজরত ওমরের ভৎ‍র্সনা শুনিয়া কোরেশ প্রধান আবু ছুফিয়ান হতাশচিত্তে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হিজরী ৮ম অব্দে রমজান মাসে হজরত মক্কা অভিমুখে অভিযান করেন। মোছলেম বাহিনী মোর্রোজ্জহরানে উপনীত হইলে, আবু ছুফিয়ান অনন্যোপায় হইয়া হজরতের সমীপে এছলাম গ্রহণের প্রার্থনা

জ্ঞাপন করিলেন। আবু ছুফিয়ান এছলাম গ্রহণ করিলে, হজরত ওমর সানন্দে বলিয়াছিলেন—"আমার পিতা খত্তাব এছলাম কবুল করিলেও আমার এতদূর আনন্দ হইত না, যে আনন্দ আবু ছুফিয়ানের এছলাম গ্রহণে আজ আমি পাইয়াছি।"

শেষ-নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা বিপুল সমারোহে মক্কা প্রবেশ করিলেন। কা'বা গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া এক অমূল্য সারগর্ভ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর খোৎবা দান করিলেন। সেই খোৎবার অবিকল নকল আজও ইতিহাসে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু আমাদের অবহেলার ফলে আমাদের দেশে তাহার প্রচার নাই।

অনন্তর হজরত ছফা পর্ব্বতে আরোহণ করেন। মক্কার চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া বায়াৎ করিতে লাগিল। এই সময়ে ওমর ফারুক হজরতের নিকট অথচ অল্প নীচে উপবেশন করিয়াছিলেন। হজরতের ইঙ্গিতে তিনি স্ত্রীলোকদের বায়াৎ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বজগৎ-স্বামী আল্লারই উপাসনার জন্য কল্যাণময় কা'বার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সেই পবিত্রতম গৃহে মানুষের হাতের গড়া মূর্ত্তিরই অর্চ্চনা হইতেছিল। সহস্র বৎসর ধরিয়া কা'বার ক্রন্দন রোল উঠিতেছিল। কিন্তু জগতে ইহার প্রতিকার করিবার কেহই ছিল না। আজ হজরত ছরওয়ের কায়েনাত মোহাম্মদ মোস্তফা তাহার সেই রোদন ধ্বনি বন্ধ করিলেন। কা'বার সেবার ভার বহু সহস্র বৎসর পরে আবার এবরাহিম নবীর ভক্তের হস্তে সমর্পিত হইল।

حق بحقدار رسيد

হোনায়নের যুদ্ধ

খায়বর-যুদ্ধের পর হজরত ওমর সসৈন্যে হওয়াজেন কবিলার বিরুদ্ধে

অভিযান করিয়াছিলেন। মহাবীরের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া তখন তাহারা পলায়ন করিয়াছিল। কাজেই কোন যুদ্ধ হয় নাই।

মোছলেম-সৈন্য-বাহিনী মদিনা হইতে মক্কা বিজয়ে বহির্গত হইলে, হওয়াজেন কবিলাও যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম লইয়া তাহাদের গতি রোধে অগ্রসর হইল। মোছলেম-বাহিনী ইতিপূর্ব্বেই মক্কায় পঁহুছিয়াছিল। সুতরাং শত্রুগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হইল। আরাফাত ময়দানের অপর পারে হোনায়ন নামক স্থানে আসিয়া আড্ডা করিল। এই সংবাদ হজরতের নিকট পঁহুছিলে, তিনি ১২০০০ দ্বাদশ সহস্র মোছলেম সৈন্য তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। হোনায়নে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিলে, ওহদের যুদ্ধের ন্যায় বিজয়ী মোছলেম সৈন্যগণ 'গণিমতের' প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। শত্রুসৈন্য হঠাৎ ভীষণ বেগে আক্রমণ করিল। অনেক বড় বড় মোছলেম বীরের পদস্খলন হইল। বীরবর হজরত ওমর একদল সৈন্য লইয়া সিংহ বিক্রমের সহিত আক্রমণ ও প্রত্যাক্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মোছলেম বাহিনী জয়ী হইল। ৬০০০ শত্রুসৈন্য ধৃত ও বন্দী হইল।

প্রথম খলিফা



হোদায়বিয়ার সন্ধির পর বিশ্ব-পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন রাজা বাদশাহদিগকে এছলামের সুসংবাদ প্রেরণ করিয়া এছলামের আহ্বান জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অন্ধ-বিশ্বাসী জড়পূজকগণ ইহাতে ভীষণ ভাবে ক্ষেপিয়া উঠে। বাইজেণ্টাইন সম্রাট আরব দেশ আক্রমণ করিবেন বলিয়া ঘন ঘন ধমক দিতে আরম্ভ করেন। একদা হিজরী ৯ম অব্দে গুজব রটিল, রোমান সম্রাট আরব আক্রমণে বাহির হইয়াছেন। মোছলেমকুলে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা জেহাদের জন্য অর্থ-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। ছাহাবীগণ যথাসাধ্য চাঁদা দিতে লাগিলেন। হজরত ওমর ফারুক আপন সম্পত্তির পূর্ণ অর্দ্ধাংশ রছুলুল্লার চরণ-প্রান্তে উপস্থিত করিলেন। অবশেষে গুজব মিথ্যা সাব্যস্থ হইল ;—কাজেই যুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু রোম-সম্রাট আরব দেশ আক্রমণের সঙ্কল্প কখনও ত্যাগ করেন নাই। বরং আক্রমণের আশঙ্কা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ফলে হিজরী একাদশ সালের ছফর মাসে পুনঃ যুদ্ধায়োজন আরম্ভ হয়।

ইতিমধ্যে হজরত মোস্তফা জ্বরাক্রান্ত হইয়া প্রায় তের দিন পীড়িত

ছিলেন। জ্বরের অবস্থা কখনও এক প্রকার ছিল না। কখনও জ্বরের প্রকোপে শয্যাগত হইতেছেন। কখনও সুস্থদেহে মছজেদে নামাজ পড়িতে যাইতেছেন। এমনকি শেষ দিবস দেহ ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় সহাস্য বদনে গৃহ দ্বারে বসিয়াছিলেন। ফলে ছাহাবীগণ আকা মোস্তফার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কতেকটা নিশ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু সতর্ক নির্ম্মম কাল সংগোপনে আসিয়া ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিবসে পুণ্যময় শরীর হইতে পবিত্র প্রাণবায়ু বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে আল্লাহ তাঁর প্রেরিত পুরুষগণকে পুনরাহ্বান করেন। ঈছা, মূছা প্রভৃতি অনেক প্রেরিত পুরুষেরই জীবনীতে ইহা দৃষ্ট হয়। হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফাও ঠিক তদ্রূপ পুনরাহুত হইলেন।

মহানবীর দেহ ত্যাগের পর মোছলেমদিগের খলিফা বা তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া, তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন কে, ইহা লইয়া বিষম গোল উপস্থিত হয়। বনি হাশেম পূর্ব্ব হইতে এই চেষ্টায় ছিল যে, তাহাদের নেতা হজরত আলীই খলিফা হউন। শেষ-নবী যখন রোগ শয্যায় শায়িত, তখন একদিন হজরত আব্বাছ হজরত আলীকে ভাবী খলিফা সম্বন্ধে হজরতের উপদেশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উত্তরে হজরত আলী বলিলেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। হজরত আলীর উক্তিতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, হজরত তাঁহাকে খলিফা মনোনয়ন করিবেন কিনা, এই বিষয়ে তাঁহার গভীর সন্দেহ ছিল। অন্যদিকে আনছারগণের ইচ্ছা, তাঁহাদের দলপতি এবনে-এবাদা এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্ব্বাচিত হউন। মোহাজেরগণ তাঁহাদের নেতাই নির্ব্বাচনের যোগ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ব্যাপার এতই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যে, মোছলেমগণ প্রিয় নবীর সমাধিকরণের চিন্তা ত্যাগ করিয়া, খেলাফৎ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

চিন্তাশীল ফারুক দেখিলেন, ব্যাপার আর কিছুদূর গড়াইলে, এইখানেই এছলাম্ ও মোছলেম জাতির জীবন্ত সমাধি হইয়া যাইবে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া, হজরত আবুবকরকে খলিফা মান্য করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তে বায়াত করিলেন। মোছলেমগণ দলে দলে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া হজরত আবুবকরের বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিলেন। সুতরাং হজরত আবুবকরই প্রথম খলিফা নির্ব্বাচিত হইলেন।

এই বায়াত কালে হজরত ওমর ফারুকের যে ত্যাগ-মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

বায়াতের উদ্দেশ্যে ত্যাগবীর ফারুক হজরত আবুবকর ছিদ্দিকের সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু মহামতি ছিদ্দিক বলিতেছেন—

يا عمر ابسط يدک لا بايعک

"হে ওমর, হস্ত প্রসারণ কর, আমি তোমার হাত ধরিয়া তোমাকেই আমাদের নেতা মান্য করিব।" প্রত্যুত্তরে হজরত ফারুক বলিলেন—

انت افضل مني

"না, না তাহা কখনই হইবে না, তুমি আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমিই আমাদের নেতার যোগ্য।" হজরত আবুবকর ছিদ্দিক আবার ব্যগ্রকণ্ঠে বলিতেছেন,—

انت اقوے مني

"হে ওমর, তুমি আমার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী; এই মহামণ্ডলীর নেতৃত্বভার তুমিই গ্রহণ কর।" এতৎসত্ত্বেও হজরত ওমর সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। তিনি হজরত আবুবকরকে মোছলেম মণ্ডলীর নেতা—খলিফা মান্য করতঃ তাঁহারই বশ্যতা স্বীকার করিলেন। (১)

---

(১) اجتهاد

খেলাফৎ ও ফারুক

অফাতে নবীর সঙ্গে সঙ্গে খেলাফৎ-প্রশ্ন লইয়া মহামান্য ছাহাবীদিগের মত-বিরোধ সত্য সত্যই বিস্ময়কর। সোমবার দ্বিপ্রহর সময়ে উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশার গৃহে হজরত 'ছরওরে কায়েনাত' এন্তেকাল করিলেন। অথচ পর দিবস মঙ্গলবার দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার সমাধিকরণের কোন ব্যবস্থা হইল না। মাননীয় ছাহাবীগণ প্রাণাপেক্ষা প্রিয় নবীর কফন-দফনের কথা বিস্মৃত হইয়া খেলাফৎ-প্রশ্নের মীমাংসায় মনোনিবেশ করিলেন, যেন কোন শোক-সন্তাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে নাই, ইহাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? অথচ ইহা প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। ছাহাবী-দিগের শোক-সন্তাপের অবধি নাই, তাহার অভিব্যক্তি ভাষায় অবর্ণনীয়।

এই রহস্যের উত্তরে আল্লামা শিবলী ছাহেব তাঁহার "আল্-ফারুক" পুস্তকে মছনদে আবুয়্যালার (১) বরাৎ দিয়া আনছারদিগকে দায়ী করতঃ লিখিতেছেন,—

......فالانصار اجتمعوا في سقيفة بني سعدة فادركوا هم ان يحدثوا امرا يكون فيه حرب فقلت لابي بكر انطلق *

(১) (কোন লোক আসিয়া হজরত ওমরকে বলিল)......আনছারগণ ছকিফা বনি ছা'দায় সমবেত হইয়াছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর,—"তাহারা কি এমন কারণ উদ্ভাবন করিবে, যাহাতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়? আমি (হজরত ওমর) (হজরত) আবুবকরকে বলিলাম, "চল।"

اس سے ظاہر ہوگا کہ نہ حضرت عمر و غیرہ نے خلافت کی بحث کو چھیڑا تھا نہ وہ اپنی خوشی سے سقیفہ بنی سعدۃ جانا چاہتے تھے -

অর্থাৎ "অফাতে নবীর পর খেলাফৎ-প্রশ্ন লইয়া ছাহাবীদিগের মধ্যে যে গোল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার স্থত্রপাত হজরত ওমর বা তাঁহার মতাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক হয় নাই।" অতঃপর তিনি এমাম মালেক ছাহেবের রেওয়ায়ৎ উদ্ধৃত করিয়া আনছারদিগের ন্যায় কোরেশদিগকেও দায়ী করিতেছেন। (১)

সর্ব্ব শেষে আল্লামা মওছুফ নিয়োদ্ধৃত ভাষায় হজরত ওমরের ছফাই দিতেছেন,—

اس نازک وقت میں حضرت عمر نے نہایت تیزی اور سر گرمی کے ساتھ جو کار روائیاں کیں انمیں گو بعض بے اعتدالیاں پائی جاتی ہوں لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ ان ہی بے اعتدالیوں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا - بنو ھاشم کی سازشیں اگر قائم ھتیں تو اسی وقت اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا -

অর্থাৎ এই সন্ধিক্ষণে নির্ভীক ও তেজস্বী ফারুক যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে যদিও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলেও মনে রাখিতে হইবে, এই ধৈর্য্যচ্যুতির ফলেই উপস্থিত 'ফেৎনা'

ان علیا و الزبیر و من کان معهما تخلفوا في بيت بنت رسول الله -

(১) "আলী ও জোবের সদল-বলে রছুল-নন্দিনী ফাতেমার গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন।"

(বিশৃঙ্খলা) নিবৃত্ত হইয়াছিল। যদি বনু-হাশেমের ষড়যন্ত্র সফল হইত তাহা হইলে, সেই মুহূর্ত্তেই এছলামের মেরুদণ্ড বিধ্বস্ত হইয়া যাইত।

আমরা ইহাকে ত্যাগবীর হজরত ওমর ফারুকের পক্ষে যথেষ্ট ছফাই বলিয়া মনে করি না। মনে করুন, ইউরোপীয় মহা সমরে ফ্রান্সের পরেই ইংরেজেরা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। তাই বলিয়া কি ইংরেজগণ যুদ্ধের দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইবে? অতএব হজরত ওমর ফারুকের প্রকৃত ছফাই কি তাহাই দেখা আবশ্যক।

ছহীহ্ বোখারীতে (আল্-ফারুকেও উদ্ধৃত) স্বয়ং হজরত ওমর হইতে বর্ণিত আছে—

كان من خبرنا حين توفى الله نبيه ان الانصار خالفونا واجتمعوا
باسرهم فى سقيفة بنى سعدة وخالف عنا على والزبير ومن معهما
واجتمع المهاجرون الى ابى بكر

"অফাতে নবীর পর আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবার মানসে আন্ছারগণ ছকিফা বনি ছা'দায় সমবেত হইলেন এবং আলী আর জোবেরও সদল বলে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে মোহাজেরগণ আবু বকরের নিকট সমবেত হইয়াছিলেন।" সুতরাং কোন দলই যে নির্লিপ্ত ছিলেন না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এমতাবস্থায় হজরত ওমর ফারুক মোহাজের-দলের নেতা হজরত আবু বকর ছিদ্দিকের নির্ব্বাচন সমর্থন করিলেন কেন এবং তাহাতে সফলকাম হইলেন কিরূপে, তাহাই বিচার্য্য। এই সমর্থন ও সফলতার সঙ্গত কারণ উদ্ভাবিত হইলে, নিশ্চয়ই হজরত

ফারুকের নির্দ্দোষিতা ও নিরপেক্ষতা সপ্রমাণ হইবে। হজরত ওমর হইতে বর্ণিত আছে—

يا ابا بكر انطلق بنا الى اخواننا من الانصار فانطلقنا نؤمهم حتى جئناهم

"হে আবু বকর! চল, আন্‌ছার ভ্রাতৃবর্গের নিকট যাই। তার পর তাহাদের মধ্য হইতে এমাম নির্ব্বাচন করিবার জন্য চলিলাম, যাবৎ আমরা তাঁহাদের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম।"

হজরত ওমর ছকিফা বনি ছা'দা গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। আন্‌ছারগণ খেলাফতের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতেই ভুল করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা

منا امير و منكم امير يا معشر قريش

"হে কোরেশগণ, তোমরা তোমাদের নেতা নির্ব্বাচন কর, আর আমরা আমাদের দলপতি নির্ব্বাচন করিব" বলিয়া কোরেশদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন। এই সম্বন্ধে আরও একটি বিশ্বস্ত রেওয়ায়ৎ উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

عن عبد الله قال لما قبض رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت الانصار منا امير و منكم امير فأتاهم عمر فقال يا معشر الانصار الستم تعلمون ان رسول الله قد امر ابا بكر ان يوم الناس

"আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, রছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহো আলায়হে ও ছল্লম প্রাণ ত্যাগ করিলে, আন্‌ছারগণ বলিতে লাগিলেন, "আমাদের আমির (নেতা) আমাদিগের মধ্যে হইতে আর

তোমাদের আমির তোমাদের মধ্যে হইতে।" অনন্তর ওমর আসিয়া বলিলেন,—"তোমরা কি জাননা, রছুলুল্লাহ সমস্ত মণ্ডলীর এমামত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন আবু বকরকে।" (১) এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই হজরত ফারুক হজরত আবু বকর ছিদ্দিকের নির্ব্বাচনে জয় লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

বস্তুতঃ হজরত ওমর ফারুক আনছার দলপতি ছা'দ বিন এবাদা বা কোরেশ-পতি আলীর নেতৃত্ব অগ্রাহ্য করিবার জন্য প্রিয় নবীর সমাধিকরণের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা সত্য নহে। বরং এছলামের মেরুদণ্ডস্বরূপ খেলাফৎ তথা এত্তেহাদে এছলামী সম্বন্ধীয় ভুল ধারণা অপনোদনের জন্যই তিনি এমনভাবে অধীর ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রছুলের শোকে এবং এছলামের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি এতদূর বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মদিনার মছজেদে গিয়া তিনি বজ্র কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"যে বলিবে, হজরতের অফাৎ হইয়াছে তাহাকে কতল করিয়া ফেলিব।" আবার বিবী ফাতেমা জাহরাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"হে নবী-নন্দিনি! তুমি আমাদের বড়ই প্রিয়; কিন্তু (খেলাফৎ প্রসঙ্গ লইয়া) তোমার গৃহে যদি এরূপ লোক সমাগম হয়, তবে আমি উহা অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দিব।" হজরত ওমর এই ভাবেই সেই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন পূর্ব্বক এছলামকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আজ হিজরী চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কোথা হইতে হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া সেই ভ্রান্ত ধারণা আবার মোছলমানদিগের সম্মুখে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। আবার তুর্কী-মোছলেম, হালাকু খাঁর, এবং মিছরী-মোছলেম, ফেরআউনের

---

(১) ابن الجوزي

উত্তরাধিকারী বলিয়া গর্ব্ব করিতেছে। হে আল্লাহ্! তোমার এছলামের সম্মান রক্ষার্থ তুমি কি দ্বিতীয় ফারুকের সৃষ্টি করিবে না?

হজরত ওমর ফারুকের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হইল। অন্যান্য ছাহাবীগণের আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। সমাজ সভ্যতা এবং গুরু-ভক্তি-নীতির কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, খেলাফৎ-সমস্যা-জনিত প্রাগুক্ত মত-বিরোধ আন্ছার, মোহাজের বা কোরেশ কোন দলের পক্ষেই দূষণীয় বিবেচিত হইবে না। গুরু-ভক্তির নিদর্শন, গুরুর বচন-সেবায়—তাঁহার চরণ-সেবায় নহে, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

হজরত ছরওরে কায়েনাত যে দিন ইহধাম ত্যাগ করেন, হজরত আব্বাছ ব্যতীত সে কথা সেদিন অন্য কোন ছাহাবী কল্পনাও করেন নাই। প্রিয় নবীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া মোস্তফা চরণে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক "নির্জ্জন গুহার দোসর বন্ধু" হজরত আবু বকর ছিদ্দিক স্বগৃহে চলিয়া যান। এমতাবস্থায় ছাহাবীগণ খেলাফৎ সম্বন্ধে নবীর শেষ ও বিশেষ উপদেশ গ্রহণ যে অনাবশ্যক বা সঙ্কোচজনক মনে করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। রোগ-শয্যায় গুরুর নিকট এরূপ উপদেশ গ্রহণ ভক্তের পক্ষে কিরূপ দুঃসাধ্য দুর্ব্বিসহ ও অসম্ভব, তাহা ভক্তে ভিন্ন বুঝিবে কে?

পক্ষান্তরে এছলামের শত্রু কাফের ও মোনাফেকগণ রহমতুল্লিল আ'লমীনের লোকান্তরের প্রতীক্ষায় ছিল। তাহারা মনে করিত, "হজরতের অভাবে মোছলমানদিগের ঐক্য-বন্ধন ও ধর্ম্মভাব শিথিল হইয়া যাইবে। তাঁহার যাদু প্রভাবে মাত্র (নাউজু বিল্লাহ) মোছলেম-মণ্ডলী এরূপ শক্ত ও দৃঢ় হইয়া আছে। তাঁহার লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা মোছলমানদিগের মধ্যে ফেৎনা উপস্থিত করিতে পারিবে।" ছাহাবীগণ, বোধ হয় কাফের মোনাফেকগণের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, ভবিষ্য 'ফেৎনার' পথ রুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় রহমতুল্লিল আ'লমীনের

পবিত্র দেহ সম্মুখে থাকিতেই নিজেদের খলিফা নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব প্রিয় নবীর কফন-দফন অপেক্ষা তাঁহার সাধনার সত্য—এছলামের সেবা যদি মহামতি ছাহাবীদিগকে এরূপ বিচলিত করিয়া তুলিয়া থাকে, সেই জন্য তাঁহাদিগকে অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা কোন মতেই সঙ্গত হইবে না।

দ্বিতীয় খলিফা



দুই বৎসর তিন মাস কাল সুচারুরূপে খেলাফতের কার্য্য সম্পাদন করিয়া, হিজরী ত্রয়োদশ সালের জমাদিয়স্‌সানী মাসে হজরত আবু বকর ছিদ্দিক ইহলোক ত্যাগ করেন। দক্ষিণ বাহু স্বরূপ থাকিয়া, খেলাফৎ সংক্রান্ত কার্য্যে বিচক্ষণ ফারুক তাঁহার সহায়তা করিয়াছেন। হজরত আবু বকর তাঁহার গুণ ও যোগ্যতায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকেই দ্বিতীয় খলিফা মনোনয়ন করিবেন, স্থির করিলেন। দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে ছাহাবীদিগের সহিত ভাবী খলিফা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। আবদুর রহমান বিন্‌ আউফ্‌ এবং হজরত ওছমান হজরত ওমরের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। হজরত আবু বকর ছিদ্দিক যেন মোছলেমদিগের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, ওমর ফারুক খলিফা নির্ব্বাচিত হইলে, অন্ততঃ অধিকাংশ লোক সন্তুষ্ট হইবেন। সুতরাং তিনি হজরত ওমরকেই ভাবী খলিফা মনোনীত করিলেন।

আহাদ্‌ নামা লেখিবার জন্য হজরত ওছমানকে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আল্লার নাম লইয়া লেখিতে আরম্ভ করিলেন। "ওমরকে ভাবী খলিফা মনোনীত করিলাম ইত্যাদি" এই কথা কয়টী মাত্র লেখিতে বাকী আছে, এমন সময়ে হজরত আবু বকর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। পূর্ব্বালোচনার

উপর নির্ভর করিয়া হজরত ওছমান সেই অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরে হজরত আবুবকর স্বস্থ হইলে, হজরত ওছমান সেই সংযোজিত অংশ সহ আহাদ্-নামা পড়িয়া শুনাইলেন। হজরত আবুবকর প্রীত হইলেন। "আল্লাহো আকবর" ধ্বনিতে আপন সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। (১)

মনোনয়ন-পর্ব্ব শেষ হইল। নির্ব্বাচন-পর্ব্ব এখনও বাকী আছে। প্রথম খলিফা মৃত্যু শয্যায় শায়িত। অন্য দিকে রছুলের এন্তেকালের পর খেলাফৎ লইয়া যে ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার স্মরণ আছে। সম্ভবতঃ সেই জন্য নির্ব্বাচন-পর্ব্বের শেষ অঙ্ক তিনি আপন জীবদ্দশায় দেখিয়া যাইতে ইচ্ছুক। মজ্লিছে শূরা বা সাধারণ সভা আহুত হইল।

হজরত আবু বকর আপন দাসকে তাঁহার নিজের প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইলেন। তিনি সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া জনমত সাপেক্ষ আহাদ্-নামা পাঠ করিতে লাগিলেন, "..............আমি ওমরকেই তোমাদের খলিফা মনোনয়ন করিলাম। আশা করি, তোমরা এই মনোনয়ন সন্তোষের সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকেই মান্য করিবে এবং তাঁহারই বশ্যতা স্বীকার করিবে।" সমবেত জনমণ্ডলী সেই মনোনয়নই সমর্থন করিলেন। হজরত ওমর ফারুক দ্বিতীয় খলিফা নির্ব্বাচিত হইলেন। নির্ব্বাচনের পর ফারুককে ডাকিয়া, হজরত আবু বকর ছিদ্দিক বহু মূল্যবান উপদেশ দান করিলেন।

এই নির্ব্বাচনোপলক্ষে খলিফা-জীবনের শেষ খোৎবায় হজরত আবুবকর ছিদ্দিক নিম্ন লিখিত মর্ম্মে ফারুকে আ'জমের পরিচয়

(১) ইতিহাস ও রাষ্ট্র-জগতের সম্পদ, এই আহাদ নামা ইন্‌শা-আল্লাহুল্ আজিজ "ছিদ্দিক-চরিতে" উদ্ধৃত হইবে।

দিয়াছেন,—যিনি শক্তি ও সংযমে তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কঠোরতায় যিনি তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর, অথচ বিনয়ে যিনি তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিনয়ী, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও কর্ম্মকুশল এবং বিপদে যাঁহার চাঞ্চল্য নাই, জ্ঞান লাভে যাঁহার সঙ্কোচ নাই, বাক্য ও কার্য্যে যাঁহার পার্থক্য নাই সেই ওমর বিন্ খত্তাব ব্যতিরেকে নেতৃত্বের (খেলাফতের) যে গুরু দায়িত্ব-ভার আমার স্কন্ধে ন্যস্ত, তাহা কখনও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইত না;—বোধ হয় ভবিষ্যতেও নির্ব্বাহ হইবে না। (১)

যাঁহারা হজরত ওমর ফারুকের নির্ব্বাচনে বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদের একদলের বক্তব্য ছিল,— وفي عمر فيْ التسلط علي الناس ফারুক লোকের প্রতি কঠোর ছিলেন। আর একদলের ধারণা ছিল, যাঁহারা হজরত ওমর ফারুকের পূর্ব্বে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্য হইতে খলিফা নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। এবরাহিম নখঈ হইতে বর্ণিত আছে—

قالوا يا علي يا فلان يا فلان ان خليفة رسول الله مستخلف
عمر و قد علم و علم الناس ان اسلامنا كان قبل اسلام عمر -

অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদী দল বলিতে লাগিল, হে আলী আল্লার রছুলের খলিফা হজরত আবু বকর হজরত ওমরকে খলিফা মনোনয়ন করিতেছেন। অথচ খলিফা এবং অপরাপর লোকে জানে যে, আমরা তাঁহার পূর্ব্বেই এছলাম গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন কালে মোছলেমদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন আমির নির্ব্বাচনের ভ্রান্ত ধারণা

(১) (ابن الجوزي (عن عاصم بن عدي

তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু একদল লোকের মধ্যে এই ভুল ধারণা প্রবেশ করিয়াছিল যে, হজরত আবু বকর পুরুষদিগের মধ্যে সকলের আগে এছলামে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি প্রথম খলিফা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং হজরত ওমর ফারুকের পূর্ব্বে যাঁহারা এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, খেলাফতের গুরু দায়িত্বের জন্য তাঁহাদের দাবী অগ্রগণ্য। এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন মানসে মহামতি ছিদ্দিক অন্তিম শয্যায় সংক্ষেপে উত্তর করিতেছেন,—

اقول استخلفت عليهم خير اهلك

"তোমার বান্দাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিকে মোছলেম মণ্ডলীর খলিফা মনোনয়ন করিয়াছি বলিয়া, আমি আল্লাহ তাআলাকে উত্তর দিব।" (১)

(১) ابن الجوزي

ফারুকের দায়িত্ব

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা 'আলায়হেছ্-ছালাতো ওছ্ ছালাম' ছৈয়দুল মোরছলীন, খাতমুন্নবীন ও রহমতুল্লিল-আলমীনরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লার অনন্ত মঙ্গলাশীর্ব্বাদ, শেষ-নবী ও বিশ্ব-পয়গম্বর রূপে আরবে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি সত্য শান্তি সন্ধি ও মুক্তির সর্ব্ব-শেষ-সুসংবাদ-বাহকরূপে আরবে পদার্পণ পূর্ব্বক আরব-ভূমিকে পবিত্র করিয়াছেন। তাঁহার রাজীব চরণ স্পর্শে আরবের উপল খণ্ডগুলি পরশ-পাথরে পরিণত হইয়াছে। তিনি পূর্ণ জগতের পূর্ণতম আদর্শ রূপে আরবে আর্বিভূত হইয়া আরবকে ধন্য করিয়াছেন। তাঁহার মহিমায় সত্য ও প্রেমে, ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গে, ধৈর্য্য ও বীরত্বে আরবের মরু প্রান্তর সুন্দর ও মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। আরব-দেশ আদর্শ মহা মানুষের অনুপ্রাণিত শিষ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এমন সময় ইচ্ছাময় আল্লাহ তাঁহার শেষ নবী, আদর্শ মহা পুরুষকে হিজরী একাদশ সালের ১২ই রবিউল আউয়াল পুণরাহ্বান করিলেন। (১)

(১) অফাতে নবীর তারিখ নম্বন্ধীয় মতভেদের জন্য মোস্তফা চরিত দ্রষ্টব্য।

ফারুকের দায়িত্ব

ভৌতিক ও আধিভৌতিক অন্ধকার দূর করিয়া স্বর্গীয় আলোতে জগতকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য আল্লাহ্ তাঁহার পবিত্র বাণী কোরআন মজিদ ও সত্য ধর্ম্ম এছলাম সহ তাঁহার পরম প্রিয় নবীকে আরবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কোরআনের শিক্ষা, এছলামের সত্য এবং শেষ নবীর আদর্শ তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী গ্রহণ ও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। এমন সময় আল্লাহ্ তাঁহার এই আদর্শ মহা পুরুষকে পুনরাহ্বান করিলেন।

পাঠকগণ "প্রথম খলিফা"র অধ্যায়ে পাঠ করিয়া আসিয়াছেন যে, হজরত বিশ্বের বিভিন্ন রাজা বাদ্‌শাহদিগকে এছলামের সুসংবাদ প্রেরণ করিয়াই অফাৎ পাইয়াছেন। প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর ছিদ্দিক তাঁহার সেই আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হজরত ওমর ফারুক মোস্তফা চরণে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। প্রথম খলিফার যোগ্য সহকর্ম্মীরূপে সেই দায়িত্ব ভারের অনুমান ও অনুভব করিয়াছেন। আজ প্রথম খলিফার অন্তর্দ্ধানে সেই দায়িত্ব-ভার আপন স্কন্ধে বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এছলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মানব-চরিত্রের যে শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছিল, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। আরবের বাহিরে সেই পূর্ব্বাবস্থা এখনও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। "ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র" নামে দুইটী শক্তি একে অন্যের উপর প্রভাব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মানসে পুরুষকে কাপুরুষ ও মানুষকে অমানুষ করিয়া অজ্ঞান-অন্ধকারের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। তথাকথিত ধর্ম্ম মানুষকে অন্তর্ম্মুখী ও ধ্যানমগ্ন করিবার ভাণ ধারণ পূর্ব্বক রোহবানিয়ত বা সন্ন্যাসের নামে দুনিয়ার সুখ সম্পদ 'জীনতুল্লাহ্' হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। সমাজ ও সমষ্টি-চিন্তা এবং মনুষ্যত্বের লোপ সাধন করিয়াছে। আবার তথাকথিত "রাষ্ট্র" বিবেক-বুদ্ধির মস্তক চর্ব্বণ করিয়া অনাচার অবিচার স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচারের সৃষ্টি করিয়াছে।

ফলতঃ এই দুই "ভিন্নমুখী" পাপ-শক্তির শাসন-ভার বহনে ধরিত্রী একেবারে অসমর্থ হইয়াছে। এই দুই পাপ-শাসনের হস্ত হইতে জগত ও জগদ্বাসীকে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প লইয়া শেষ-নবী মোহাম্মদ ছরের আদর্শ ও উপদেশ সম্মুখে রাখিয়া মহাবীর ফারুক 'কমর-বস্তা' হইয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি শেষ-নবীর শিষ্য মোছলেম-মণ্ডলীর পরিচালকরূপে নিজের ও উম্মতে মোহাম্মদীর দায়িত্ব-ভার তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলেন। হজরত আবুবকর ছিদ্দিকের খেলাফৎ-কালে মহা-নবীর আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। সেই আরব্ধ কার্য্য আরব্ধই রহিয়াছে, তাহাও দেখাইয়া দিলেন।

আজ স্বর্গে কি আনন্দ লহরী প্রবাহিত হইতেছে; জানি না। কিন্তু যেদিন তিনি এছলাম কবুল করিয়াছিলেন, সেদিন স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল আসিয়া, ফেরেশতা মণ্ডলীর হর্ষানন্দের সংবাদ দিয়া গিয়াছিলেন!

لقد فرح اهل السماء باسلام عمر (عن يونس بن عبيد عن الحسن)

"ওমরের এছলাম গ্রহণে স্বর্গবাসী ফেরেশতাগণ আনন্দিত হইয়াছেন।" আজ 'মাহবেতে জিব্রাইল' ছৈয়েদুল-মোরছলীন ইহ জগতে নাই।

তাই তাঁহাদের আনন্দ সংবাদ জ্ঞাত হইবারও কোন উপায় নাই।

আজ রছুলের ইচ্ছা ও ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। রছুলুল্লাহ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

اللهم اعز الاسلام بعمر (عن علي بن ابي طالب)

"হে আল্লাহ! ওমরের দ্বারা এছলামের সম্মান রক্ষা করিও।" মহানবী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিয়াছিলেন,—

عمر بن الخطاب معي حيث احب وانا معه حيث يحب الحق بعدي مع عمر بن الخطاب حيث كان - (عن ابن عباس عن اخيه الفضل)

অর্থাৎ "ওমর-বিন-খত্তাব আমার দোসর যেহেতু, আমি তাহাকে ভালবাসি। আমি তাহার দোসর, যেহেতু সে আমার পরে সত্যকে ভালবাসিবে। ওমর-বিন-খত্তাব সত্যের প্রতিষ্ঠা করিবে, যেমন ইতিপূর্ব্বে করিয়াছে।"

সত্যের প্রতিষ্ঠা এছলাম প্রচারের গুরু দায়িত্ব ভার লইয়া আজ হজরত ওমর মোছলেম মণ্ডলীর খলিফারূপে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। হজরত ওমর ফারুক কিরূপে এই মহা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, আমার দুর্ব্বল ভাষায় তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। নিঃসম্বল আমি, ভরসা তোমার, হে আল্লাহ!

وما توفيقي الا بالله المعين

গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা



এছলামের অভ্যুদয়কালে আরবের দুইদিকে দুই বিশাল সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল। পূর্ব্বে শক্তি ও সমৃদ্ধিশালী পারস্য, পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্য। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুই সাম্রাজ্যের সহিত আরবের ভীষণ সংঘর্ষ চলিতেছিল। অধীন করিবার মানসে উভয় রাজ্যই বহুবার আরব-দেশ আক্রমণ করিয়াছিল। সত্য বটে, আরব কাহারও অধীনতা স্বীকার করে নাই। কিন্তু এই সকল সংঘর্ষের ফলে আরবগণ যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

বিশ্ব-পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা নবুয়ত প্রাপ্তির পর, বিশ্বের চতুর্দ্দিকে এছলামের সুসংবাদ প্রেরণ করেন। এই সঙ্গে রোম ও পারস্য-সম্রাটকেও এছলামের নিমন্ত্রণ দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে সম্রাটগণ ভীষণ উত্তেজিত হন।

রোম-সম্রাটের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহার শাম-দেশবাসী প্রজাগণ হজরতের পত্রবাহক কাছেদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিয়া তাহার সমস্ত আসবাব পত্র লুঠিয়া লইল। হারেছ নামে আর এক কাছেদকে পথি মধ্যে তাহারা প্রাণে বধ করিল।

এই সময়ে পারস্যের সিংহাসনে পরবেজই অধিরূঢ় ছিল। মহানবীর

পুণ্যময় পত্রখানা পাঠ করিয়া রাগভরে বলিয়া উঠিল—"আমার দাসানুদাস হইয়া আমাকে এইরূপ পত্র লিখিতে পারে!" দুষ্টমতি পরবেজ ইহাতেও ক্ষান্ত হয় নাই। বরং তৎমুহূর্ত্তেই ত্রাণকর্ত্তা হজরত মোস্তাফাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া পারশ্যে লইয়া যাইবার আদেশ করিল। এমনের শাসনকর্ত্তা বাজানকে এই আদেশ প্রতিপালনের জন্য পত্র লিখিল। কিন্তু ইতিমধ্যে পরবেজ আপন সন্তান কর্ত্তৃক নিহত হয়।

রোম ও পারশ্য সম্রাটগণ রছুলের জীবদ্দশায় অনেক বার আরব আক্রমণের চেষ্টা করিয়াও নানা কারণে পশ্চাৎপদ রহিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর শত্রুগণের উদ্যম বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। সুতরাং প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক আত্মরক্ষার্থ সেই বিপুল শক্তিশালী রোম-সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এরাক ও সিরিয়ায় সৈন্য চালনা করিয়াই প্রথম খলিফা লোকন্তরিত হন।

হজরত আবুবকরের মৃত্যুকালে দ্বিতীয় খলিফার নির্ব্বাচনোপলক্ষে বিভিন্ন অঞ্চলের মোছলমান প্রতিনিধিগণ মদিনায় সমবেত হইয়াছিলেন। নানা গুরুতর বিষয়ের আলোচনার নিমিত্ত তিন দিন ধরিয়া সেই প্রতিনিধি সম্মিলনের অধিবেশন চলিতেছিল। বাগ্মীবর হজরত ওমর সেই সভায় জেহাদ সম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তদানীন্তন অবস্থা বিবৃত করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাঁহাদিগকে সুন্দর ও বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। সমবেত প্রতিনিধিগণ ধর্ম্ম-যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হইলেন। এমন কি আরবের খৃষ্টানগণও সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল। মোছলেম রমণীগণ স্বেচ্ছাসেবক-শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

অনন্তর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই সমরানল লক্ লক্ করিয়া শাম ও এরাককে গ্রাস পূর্ব্বক পারশ্য পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। লক্ষাধিক ঈরানী সৈন্য নিহত হইল। ছয় হাজারের অধিক মোছলেম-সৈন্য শহীদ হইল।

পারস্যের রাজধানী পর্য্যন্ত মোছলমানদিগের অধিকারভুক্ত হইল। মোছলেম সৈন্যগণ পারস্যের রাজদরবারে প্রবেশ করিয়া জুম্‌আর নমাজ সমাপন করিলেন। (হিজরী ১৪ সাল)

হিজরী ২৩শ সালের মধ্যে সমস্ত শাম, এরাক, পারস্য, খোরাছান, তিবরস্তান, আরমেনিয়া, কেরমান, চিস্তান, মকরান প্রভৃতি মোছলমান-দিগের হস্তগত হইল। ইতিমধ্যে মিছর দেশও মোছলেম সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। অন্য কথায় ভারতবর্ষ ও চীন দেশ ব্যতীত এশিয়া ও আফ্রিকার সুসভ্য জনপূর্ণ দেশ সমূহের সমবায়ে এক বিশাল সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। মক্কার উত্তরে ১০৩৬ দক্ষিণে ৪৭৩ পূর্ব্বে ১০৮৭ মাইল পশ্চিমে জেদ্দা পর্য্যন্ত মোছলেম সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। এই সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের পরিমাণ ফল ২২৫১০৩০ বর্গ মাইল।

ফারুকের শত্রুদিগের মধ্যে ঈরানী ও রোমকগণই প্রধান। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন বিস্তৃতিতে যেমন ঈরান সাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তেমন তাহার সৈন্য-সংখ্যাও অগণিত—ধন ভাণ্ডার অফুরন্ত। আবার রোমকগণ সমরনিপুণ জাতি, তাহাদের ক্ষাত্রশক্তি তদানীন্তন জগতে অতুলনীয়। পক্ষান্তরে মোছলমানগণ সংখ্যায় অল্প ও ধন-সম্পদবিহীন। এহেন আরবগণ এই সকল সাম্রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, কিরূপে এই বিশাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভিনব রহস্য। ইহার সরল সহজ ও একমাত্র উত্তর এই যে, মহানবীর সাহচর্য্যের ফলে, সত্যই ছিল তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। আর ছিল—আল্লাহ্ ও আল্লার বাণী কোরআনের প্রতি তদানীন্তন মোছলমানদিগের অগাধ বিশ্বাস ও অচল ভক্তি।

এই ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে, তাঁহারা কর্ত্তব্যে অনুরক্ত, সঙ্কল্পে দৃঢ়, সাহসে দুর্জ্জয় হইয়াছিলেন। এছলামের সম্মান রক্ষার্থ পৃথিবীর সমস্ত সুখ-সম্পদ

বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন। এমন কি এছলামের খাতিরে—সত্যের খাতিরে জীবন দান করিতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাই উপযুক্ত পরিচালকের অধীন থাকিয়া মোছলেম-শক্তি ঈরাণের জন-শক্তি আর রোমকদিগের ক্ষাত্রশক্তি বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কায়ছর ও কিছ্‌রার অত্যাচার-মূলক তখ্‌ৎ উৎখাত করিয়া আরব-মোছলেমগণ অর্দ্ধ-পৃথিবী-ব্যাপী ন্যায়তন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারের চির নির্ব্বাসন করিয়া, মানবোচিত সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা এবং সত্য ধর্ম্ম জ্ঞান বিস্তারে সফলকাম হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রক্ত বিনিময়ে জগতে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজিত হইয়াছিল।

এই বিশাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মহাবীর হজরত ওমর ফারুকের বিচক্ষণতা, মোছলেম সৈন্যদিগের সাহস সঙ্কল্প কর্ত্তব্যানুরক্তি এবং বীরত্ব ও রণকৌশলের বিবরণ নিরতিশয় সুন্দর ও চিত্তাকর্ষী হইলেও, তাহার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। ফারুকে আ'জমর পুত পবিত্র চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঠকদিগকে যেন বেগ পাইতে না হয়, শুধু তজ্জন্য কয়েকটি যুদ্ধ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিশেষ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াই নিরস্ত হইব। আল্লাহ্‌তাআলা তওফিক দিলে, ফারুকে আ'জমের রাজ্য-বিস্তারের ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ করিব।

শাম-বিজয়



আজনাদীন সমর

চুরি করা মহাপাপ, ইহা যেমন পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম স্বীকার করে এবং সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল মানুষের বিশ্বাস; ঠিক তদ্রূপ দূত অবধ্য, ইহাও জগতের চিরন্তন ও সর্ব্ববাদীসম্মত বিধান। শামবাসী রোমক প্রজাগণ এই চিরন্তন বিধান লঙ্ঘন পূর্ব্বক শেষ-নবীর কাছেদকে বধ করিয়া ফেলিল; মদিনাবাসী বিশেষ করিয়া মোছলেমদিগের শামদেশ যাত্রা দুরূহ ও বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিল; ক্রমে মদিনা আক্রমণে উদ্যত হইল। মোছলেমগণ আত্মরক্ষার্থ উম্মুল-মোমেনীন হজরত খদিজার 'ক্রীতদাস' মুক্ত মোছলেম জায়দ বিন্ হারেছার অধিনায়কত্বে হিজরী ৮ম সালে শামদেশ আক্রমণ করেন। জয় পরাজয়ের অনির্দ্দিষ্টতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সেই যুদ্ধাগ্নি রহিয়া থমকিয়া হজরতের অফাৎ পর্য্যন্ত ধূমায়িত হইতেছিল। কিন্তু অফাতে নবীর সঙ্গে সঙ্গে শত্রুগণের উদ্যম বৃদ্ধি পাইল। অতি ক্ষিপ্রতার সহিত তাহারা মোছলমানদিগের ধ্বংসায়োজনে ব্যাপৃত হইল। যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই দেখিয়া, প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক,—"এছলাম রক্ষার্থ জেহাদে

অগ্রসর হও, হয় জয়ী হইবে, না হয় শহীদ হইবে” বলিয়া আবু ওবায়দা, এজিদ বিন্ আবি ছুফিয়ান, শরজিল এবং আমর বিন্ আ'ছের অধিনায়কত্বে মোছলেম বাহিনীকে যথাক্রমে হামছ দেমস্ক, আরদন ও ফেলিস্তিন অভিযানে প্রেরণ করেন। রোমকগণ পূর্ব্ব হইতে বিরাট আয়োজনসহ প্রস্তুত ছিল। সুতরাং যাত্রার প্রথম পদ বিক্ষেপে মোছলেম বাহিনীর প্রতিরোধের নিমিত্ত অগ্রসর হইল। যাত্রার প্রথম গতিতে ভীষণ বাধা পাইয়া সেনাপতিগণ মদিনায় সংবাদ প্রেরণ করিলেন। অতিরিক্ত সেনা-বলের ব্যবস্থা হইল। এরাকের দিক হইতে মহাবীর খালেদ বিন্ অলিদ সসৈন্যে আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। পঞ্চবাহিনী একীভূত হইয়া বীরবর খালেদের অধিনায়কত্বে ক্রমশঃ দেমস্ক গিয়া উপস্থিত হইল। সেখান হইতে ক্রম-বর্দ্ধমান অর্দ্ধ-চন্দ্রাঙ্কিত পতাকা হেলাইয়া দুলাইয়া, “আল্লাহো-আকবর” ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করিয়া, আজনাদীন অভিমুখে অগ্রসর হইল। কায়ছরের বিশাল বাহিনী ভীষণ বেগে মোছলেমবাহিনীর সম্মুখীন হইল। তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিন সহস্র মোজাহেদীনের জীবন বিনিময়ে দুর্দ্ধর্ষ মোছলেমবাহিনী জয়ী হইল। তদনন্তর মহা গাজী খালেদ দেমস্ক অবরোধে মনোনিবেশ করিলেন।

দেমস্ক-বিজয়

দেমস্ক নগর অতিশয় সুরক্ষিত। সুরক্ষিত দুর্গ প্রাচীরে থাকিয়া শত্রুগণ আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। খালেদ বিন্ অলিদ, আমর বিন্ আ'ছ, আবু-ওবায়দা ও শরজিল দ্বারগুলি আগুলিয়া নগর বেষ্টন করিয়া রহিলেন। রোম-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সৈন্যগণ দেমস্ক উদ্ধারে অগ্রসর হইল। কিন্তু মোছলেম-বীরের খরতর অসিফলকে একে একে

সমস্ত শত্রুবাহিনী বিধ্বস্ত হইয়া গেল। দেমস্কের রোমকগণ বাহিরের সর্ব্ব প্রকার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল। তথাপি নগর সুরক্ষিত বিধায়, দীর্ঘকাল অবরোধের প্রতিরোধে সমর্থ হইয়াছিল। ইতিমধ্যেই প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক লোকান্তরিত হন। হজরত ওমর ফারুক খেলাফতের ভার গ্রহণের কিছুদিন পরে, চতুর্দ্দশ হিজরীর রজব মাসে দেমস্ক নগরী জয় হইল। দেমস্ক-বাসী শান্তির ছায়ায় আশ্রয় পাইল।

ফাহল-যুদ্ধ *

দেমস্কের পতনে সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। পরাজয়ের প্রতিশোধ মানসে, রোমক সম্রাট তাঁহার সমস্ত শক্তি মোছলেম দিগের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিবার আদেশ করিলেন। দেমস্ক বিজয়ের পর মোছলেম-বাহিনী আরদন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। সুতরাং রোমক সৈন্যগণ আরদনের প্রসিদ্ধ শহর বিছানে সমবেত হইল।

মোছলেম-বাহিনী অদূরে ফাহল নামক স্থানে আড্ডা করিল। রোমকগণ ফাহল এবং বিছানের মধ্যস্থিত নহরগুলির সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল। ফলে মোছলেম-বাহিনীর পথ বড়ই দুর্গম হইয়া পড়িল। কিন্তু অদম্য মোছলেম সৈন্যগণ সেই জল ও কর্দ্দমাক্ত পথ অতিক্রম করিয়া ঢলের মত বিছানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মোছলেম বাহিনীর এই রণোন্মাদনা দেখিয়া রোমকগণ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। সেনাপতি আবু ওবায়দা মআজ বিন জবলকে মোছলেম দুতরূপে রোম সেনাপতির নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁবুর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, স্বর্ণখচিত রেশমী বস্ত্রের ফরশ মআজের দৃষ্টি-গোচর

---

* "ফাহল"এর প্রাচীন নাম ছলা। (ছলা' নহে)।

হইল। রোমকগণ লেগাম ধরিয়া, সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অবতরণের অনুরোধ জানাইয়া ঐ ফরশের দিকে ইঙ্গিত করতঃ আসন পরিগ্রহের জন্য অনুনয় বিনয় আরম্ভ করিল। মহামতি মআজ রুদ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "দীন দরিদ্র প্রজার রক্ত শোষিত অর্থে বিনির্ম্মিত স্বর্ণখচিত মনোরম ফরশে আমি উপবেশন করিতে চাহি না।" এই বলিয়া তিনি জমিনের উপর বসিয়া পড়িলেন। রোমকগণ তথাপি অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। হজরত মআজ আবার গম্ভীর বিরক্তি-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা যাহাকে সম্মান বলিয়া মনে কর, উহা প্রকৃত সম্মান নহে। আমি ঐ সম্মানের কোন পরওয়া করি না।" রোমান সৈন্যদিগের নিকট এই দৃশ্য একেবারে অদ্ভুত ও অদৃশ্য-পূর্ব্ব। তাহারা সাম্যের এই রহস্য বুঝিতে পারিল না। মুকের ন্যায় অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মআজের ইঙ্গিতে কথোপকথন আরম্ভ হইল। রোমক প্রতিনিধি, 'শক্তিশালী সম্রাট, বিশাল সাম্রাজ্য, অগণিত সৈন্য এবং তাহাদের রণনিপুণতার' গুণগান করিয়া শাম-দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্যারস্য আক্রমণের প্রতি মআজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উত্তরে মোছলেম-দূত মআজ বলিলেন,—"এছলামে আত্ম-সমর্পণ কর—নব-জীবন লাভ কর। নমাজ পড়—শরাব ছাড়। তাহা হইলে তোমরা আমাদের ভাই। যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নাই। এতদ্ব্যতীত ভয়ভীতি বা প্রলোভনে আমাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। তোমাদের অগণিত সৈন্য সংখ্যার কোন পরওয়া আমরা করি না। কারণ আমাদের আল্লাহ্ এরূপ পরওয়া করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

উত্তর শুনিয়া রোমকগণ ভাবিল, এই গোঁড়া প্রতিনিধির সহিত সন্ধির আলোচনা সম্ভব হইবে না। তখন তাহারা সেনাপতির নিকট দূত প্রেরণ

করিল। দূত গিয়া দেখে, সেখানে আরও অবাক কাণ্ড। সৈন্য শ্রেণীর মধ্য হইতে সেনাপতিকে চিনিয়া বাছিয়া লইবার উপায় নাই। রোমক দূত অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন—দেখিতে পাইলেন, সেনাপতি আবু ওবায়দা মাটীতেই বসিয়া আছেন। এই দৃশ্য তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "সেনাপতি! আপনার সৈন্য প্রতি দুই দুই আশরফী করিয়া ক্ষতিপূরণ দিব। আপনারা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হউন।" সেনাপতি আবু ওবায়দা এই শর্ত্তের সন্ধি অস্বীকার করিলেন। রোমক-দূত হতাশচিত্তে ফিরিয়া গেল।

রোমকগণ মোছলেমদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না। ফলে রণ দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। উভয় পক্ষে বিপুল সমর-সজ্জা আরম্ভ হইল। মহাবাহু আবু-ওবায়দা রণোন্মত্ত মোছলেম-সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

عباد الله استنصروا من الله النصر
بالصبر فان الله مع الصابرين

"হে আল্লার দাসগণ! আল্লার সাহায্যে জয় কামনা কর। অচল অটল রহিও। ধীর স্থির থাকিও। আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদিগেরই সহায়।"

হিজরী চতুর্দ্দশ সালের জেলকা'দ্ মাসে উভয় সৈন্যদল সম্মুখীন হইল। ভীষণ আক্রমণ ও প্রত্যাক্রমণ চলিতে লাগিল। সমর-ক্ষেত্র রক্ত রঞ্জিত হইয়া গেল। আবু-ওবায়দার বিচক্ষণতা এবং খালেদ বিন্ অলিদ, মআজ বিন্ জবল, হাশেম বিন্ ওৎবা, ছঈদ বিন্ জায়দ প্রমুখ বীর-গণের ধীরতা দৃঢ়তা ও রণনিপুণতার নিকট পঞ্চাশ সহস্র রোমান সৈন্য পরাভুত হইয়া গেল। আরদন প্রদেশ মোছলেম করতলগত হইল। বিজয়-সংবাদ মদিনায় পঁহুছিলে, খলিফা হজরত ওমর বিজিত প্রজার

ধনপ্রাণের নিরাপদতা ও ধর্ম্ম-স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ফরমান পাঠাইয়া দিলেন।

হামছ-বিজয়

দেমস্ক ও আরদন বিজয়ের পর মোছলেম-বাহিনী মুর্ত্তি-পূজকদিগের তীর্থস্থান হামছ শহর অভিমুখে রওয়ানা হইল। মধ্যপথে বা'আলবক অধিকার করিয়া হামছের নিকটবর্ত্তী হইলে, শত্রুগণ হামছের বাহিরে আসিয়া জুছিয়ায় মোছলেম বাহিনীর গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু খালেদের প্রচণ্ড আক্রমণে শত্রু-সৈন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। খালেদ হামছের দিকে অগ্রসর হইলেন। হামছের বিক্ষিপ্ত রোমক সৈন্য-গণের সাহায্যার্থ হারকল অতিরিক্ত সৈন্যবল প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। ছা'দ বিন্ আবি অকাছ এরাকে থাকিয়া এই সংবাদ অবগত হন। শত্রুর এই বাহিনীকে আগুলিয়া রাখিবার জন্য তিনি এক দল মোজাহেদ প্রেরণ করেন। মোজাহেদীন কর্ত্তৃক তাহাদের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। হামছবাসী গত্যন্তর না দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিল। আবু-ওবায়দা, এবাদা বিন্ ছামতকে তথাকার সামরিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া হোমাত নগর অধিকারে মনোযোগী হইলেন। হোমাতবাসী জিজিয়া দানে সম্মত হইয়া এছলামের আশ্রয় প্রার্থনা করিল। বিনা যুদ্ধে হোমাত অধিকৃত হইল। ক্রমে শিরজ ও মা'রতুন্না'মান মোছলেমের বশ্যতা স্বীকার করিল। তদনন্তর আবু-ওবায়দা লাজকিয়া আক্রমণ করেন। তাঁহার বিশেষ কৌশলে এই সুরক্ষিত নগরও মোছলেম অধিকারভুক্ত হইল। সমগ্র হামছ প্রদেশে 'খঞ্জর-হেলাল'-লাঞ্ছিত বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হইল। ফলতঃ হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে শাম দেশের তিনটি প্রদেশ মোছলেম সাধারণ তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইল।

বিচক্ষণ ওমর হিজরী চতুর্দ্দশ শালের জন্য মোছলেম-সৈন্য-শ্রেণীর অগ্রগতি স্থগিত রাখিবার আদেশ করিলেন।

শরজিল হামিরী হামছে শহীদ হইয়াছিলেন। একদা তিনি মোছলেম সৈন্য-শ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হামছে গিয়া উপস্থিত হন। একাকী পাইয়া শত্রু সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করে। নির্ভীক বীর শরজিল অকুতোভয়ে তাহাদের সহিত জুঝিতে লাগিলেন। সাত জন অশ্বারোহী এবং দশ জন পদাতিক যুদ্ধ করিয়া, শরজিল কর্ত্তৃক নিহত হয়। নিকটবর্ত্তী কোন গীর্জ্জায় বহু খৃষ্টান সমবেত ছিল। তাহারা নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় শরজিলের প্রতি লোষ্ট্র প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বহু সংখ্যক রোমক-শৃগালের আঘাতে সিংহ শরজিল প্রাণ ত্যাগ করিলেন। শাহাদতের সুধা পান করিয়া বীর শরজিল অমর ও চিরঞ্জীব হইলেন।

য়্যারমুকের অগ্নি-পরীক্ষা



ہم تو زندہ ہیں دنیا میں ترا نام رہے
کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نرہے جام رہے

সবিদ্যুত ঝড়-বৃষ্টি-প্রপীড়িত বকের ন্যায় হারকল রাজধানী আন্‌তাকিয়ায় বসিয়া পলায়ন-চিন্তায় নিমগ্ন। অন্য দিকে মোছলেমদিগকে যুদ্ধবিরত দেখিয়া খৃষ্টানগণ প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছায় নানা কল্পনা জল্পনা করিতেছে। হারকলের অভিমত জানিবার জন্য খৃষ্টানগণ দলে দলে রাজধানীতে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। হারকল কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এক পরামর্শ সভা করিলেন। তিনি তাহাদিগের উদ্দেশে বলিলেন,—"আরবগণ (১) তোমাদের চেয়ে সংখ্যায় স্বল্প, শক্তিতে দুর্ব্বল। তোমাদের তুলনায় তাহাদের সমরোপকরণ একেবারে নগণ্য। তথাপি তোমরা তাহাদের আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে পার না, তাহাদের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পার না, ইহার কারণ কি?" হারকল-দরবারের প্রধানগণ লজ্জায়

(১) "আরব" ও "জজিরাতুল-আরব" এক কথা নহে। আরব, এরাক ও শাম প্রদেশের সংযুক্ত নাম "জজিরাতুল-আরব" বা "আরব-উপদ্বীপ।" আল্লামা আবুল কালাম আজাদের * مسئلۂ خلافت و جزیرۃ العرب দ্রষ্টব্য।

অধোবদন হইয়া রহিল। অবশেষে একজন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল,—"আরবগণ চরিত্রবলে বলীয়ান। তাহারা রাত্রি যোগে এবাদত করে, দিবাভাগে রোজা করে, কাহারও প্রতি অত্যাচার করে না। তাহাদের মধ্যে সাম্য বিরাজমান। আর আমাদের দশা? আমরা মদমত্ত; যাবতীয় কু-কার্য্যে প্রবৃত্ত। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে আমাদের সঙ্কোচ নাই। অত্যাচার করিতে দ্বিধা নাই। অতএব তাহারা সাহসিক ও উদ্যমশীল। সঙ্কল্পে তাহারা অচল অটল পর্ব্বতের ন্যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা দুর্দ্ধর্ষ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়। আর আমাদের ধৈর্য্য বা সাহস কিছুই নাই।"

যাহা হউক খৃষ্টানদিগের উত্তেজনার ফলে হারকল তাঁহার শক্তির শেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রাদেশিক ও বিভাগীয় শাসন কর্ত্তাদিগের নামে রোমরাজ পত্র প্রেরণ করিলেন; রাজাদেশ বিদ্যুতবেগে সমগ্র রোম-সাম্রাজ্যে প্রচারিত হইল। বর্ষার প্লাবনে নিম্ন ভূমির পিপীলিকাশ্রেণী যেমন উচ্চ ভূমির দিকে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে রোম সাম্রাজ্যের প্রত্যেক কেন্দ্র ও প্রত্যেক প্রান্ত হইতে আন্‌তাকিয়ায় সৈন্য সমাবেশ হইতে আরম্ভ হইল। আন্‌তাকিয়া সৈন্যে সৈন্যারণ্য হইয়া গেল।

শত্রুর এই বিপুল আয়োজন-সংবাদ হজরত আবু-ওবায়দা বিশেষভাবে অবগত হইলেন। প্রধান প্রধান মোছলেম-বীরকে আহ্বান করিলেন। শত্রুর বিরাট আয়োজনের কথা জানাইয়া তাঁহাদের, অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। এজিদ বিন্ আবি ছুফিয়ান বলিলেন,—শহরের বাহিরে গিয়া আমাদের সৈন্যব্যূহ রচনা করা আবশ্যক। অবশ্য আমাদের স্ত্রী-পুত্র শহরেই থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে খালেদ ও আম্রকে সাহায্যার্থ আহ্বান করা হউক। শরজিল ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—এজিদ যাহা বলিয়াছেন, তাঁহা

সদিচ্ছায় ও সরল বুদ্ধিতে আমাদেরই মঙ্গলোদ্দেশ্যে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমরা কোন্ বিশ্বাসে বা কোন্ আশ্বাসে, আমাদের স্ত্রী-পুত্রদিগকে খৃষ্টানের হস্তে সমর্পণ করিব? উত্তরে হজরত আবু-ওবায়দা বলিলেন,—"আমরা খৃষ্টানদিগকে শহর হইতে বাহির করিয়া দিব।" এমন সময় শরজিল ব্যস্তসমস্ত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"হে আমির! সেই অধিকার তোমার নাই। আমরা তাহাদিগকে শাস্তি দান করিয়াছি। তাহাদিগকে শহরে বসবাস করিবার অধিকার দিয়াছি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিব কিরূপে?" হজরত আবু-ওবায়দা নিজের ত্রুটি স্বীকার করিলেন।

বিদায়-দৃশ্য

দীর্ঘ আলোচনার পর হামছ ত্যাগ পূর্ব্বক দেমস্কে খালেদের বাহিনীর সহিত মিলিত হওয়াই স্থির হইল। যাত্রার পূর্ব্বে কোষাধ্যক্ষ হাবিব বিন্ মোছ্লেমাকে আমির আবু-ওবায়দা আদেশ করিলেন,—"হামছবাসী অমোছলেম-প্রজার নিকট যে রাজস্ব আদায় হইয়াছিল, উহা তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ কর। কেননা আমরা তাহাদের সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের উপর আমাদের জিজিয়া বা রাজস্ব প্রাপ্য হইয়াছিল। এইক্ষণ আমরা সেই ভার বহনে অক্ষম। অতএব তাহাদের নিকট সংগৃহীত রাজস্ব তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। অবশ্য প্রতিশ্রুতির অন্যান্য শর্ত্ত বলবৎ থাকিবে।" আমিরের আদেশে হাবিব হামছ ও তৎসন্নিহিত বিভাগ সমূহ হইতে জিজিয়া ও রাজস্বের সংগৃহীত কয়েক লক্ষ মুদ্রা তাহাদিগকে ফেরৎ দিলেন। আবু ওবায়দা খলিফার দরবারে এই সমস্ত ঘটনা লিখিয়া পাঠাইলেন এবং অবিলম্বে দেমস্ক অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

বিদায়-কালে হামছের খৃষ্টান অধিবাসিবৃন্দ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মোছলমান-দিগকে সবিনয়ে নিবেদন করিল, মোছলমানগণ যেন আবার হামছ পুনরধিকারে অভিযান করেন। এহুদীগণ তওরাতের শপথ করিয়া বলিতে লাগিল,—"আমাদের জীবন থাকিতে কায়ছরকে হামছে প্রবেশ করিতে দিব না।" কার্য্যতঃ তাহারা তাহাই করিয়াছিল।

যুদ্ধারম্ভ।

হামছ ত্যাগের খবর যেন বিদ্যুদ্বেগে সমগ্র রোম-রাজ্যে বিস্তৃত হইল। সংবাদ পাইয়া রোমকগণের মধ্যে নবোদ্যমের সঞ্চার হইল। আরদনেও বিদ্রোহ উপস্থিত হইল।

আবু-ওবায়দা য়্যারমুকে পঁহুছিয়া খলিফার পত্র পাইলেন। যুদ্ধের সুবিধার নিমিত্ত হামছ ত্যাগ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, তিনি আবু ওবায়দার ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সসৈন্যে ছঈদ বিন্ আমের সাহায্যার্থ আসিতেছেন, আবু ওবায়দা তাহাও এই পত্রে জানিতে পারিলেন। অবশেষে খলিফা হজরত ওমর, আবু ওবায়দাকে লিখিয়াছেন,—"সৈন্যের অল্পাধিক্যের উপর জয়পরাজয় নির্ভর করে না।" খলিফার পত্র পাইয়া আবু-ওবায়দার সাহস বৃদ্ধি পাইল—আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

য়্যারমুক আরব-সীমান্তের নিকটবর্ত্তী। ময়দানের বিশেষত্বের হিসাবেও যুদ্ধের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আবু-ওবায়দা য়্যারমুকে অবস্থান করাই, স্থির করিলেন। ছঈদ বিন্ আমের তখনও আসিয়া পঁহুছেন নাই। আবু ওবায়দা নিজেদের অবস্থা এবং শত্রুর আয়োজন সবিস্তার লিখিয়া খলিফার দরবারে আর এক কাছেদ প্রেরণ করিলেন। পত্র পাইয়া ছাহাবীগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। হজরত আবদুর

রহমান বিন্ আউফ স্বয়ং খলিফাকে সেনাপতিরূপে য়্যারমুক ক্ষেত্রে যাত্রা করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু অন্যান্য ছাহাবী ভিন্নমত হইলেন। তাঁহাদের মতে খলিফার পক্ষে দারুল-খেলাফৎ ত্যাগ করা সঙ্গত নহে। সুতরাং অতিরিক্ত সৈন্য-বল প্রেরণই সাব্যস্ত হইল। আবু-ওবায়দার নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইল। এই কাছেদ এবং ছঈদ বিন্ আমেরের সেনাদল আসিয়া য়্যারমুকে পঁহুছিল। আমর বিন্ আ'ছ ইতিপূর্ব্বেই য়্যারমুকে আসিয়া আবু-ওবায়দার সহিত যোগদান করিয়াছেন। ব্যূহ রচনা আরম্ভ হইল। খালেদের ব্যবস্থানুসারে মআজ বিন্ জবল, কেয়াছ বিন্ আসিম, হাশেম বিন্ ওৎবা প্রমুখ বীরগণ বিভিন্ন শ্রেণীর নায়ক নিযুক্ত হইলেন।

অন্যদিকে দুইলক্ষ রোমান সৈন্যের বিপুল বাহিনী সুসজ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া য়্যারমুকের সম্মুখবর্ত্তী দায়রুল-জবল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিল। মোছলেম-বাহিনী সেই আক্রমণে পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল থাকিয়া, প্রচণ্ড প্রত্যাক্রমণে শত্রু-সৈন্যকে পশ্চাদ্ধাবনে বাধ্য করিল। পরাস্ত হইয়া রোমান সেনাপতি দূত পাঠাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

সন্ধ্যার সময় রোমান-দূত জারেজ মোছলেম শিবিরে আসিয়া উপস্থিত। মগরবের নমাজের পর আমির আবু-ওবায়দা রোমান দূতের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবেন, স্থির হইল। দূত নমাজের বিশেষত্ব দেখিয়াই, বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে কথোপকথনের সময়, হজরত ঈছা সম্বন্ধে মোছলেমদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাস কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু-ওবায়দা কোরআনে ঈছা নবীর যে পরিচয় আছে, তাহা পাঠ করিলে, মোতরজ্জেম তাহা বুঝাইয়া দিলেন। জারেজ, "তোমাদের পয়গম্বর সত্যই শেষ নবী" বলিয়া এছলাম কবুল

করিলেন। এছলাম গ্রহণের পর তিনি রোমান শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু হজরত আবু-ওবায়দা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, রোমানগণ তাঁহার উপর বিশ্বাস-ঘাতকতার দোষারোপ করিবে। অবশ্য মোছলেম-দূতের সহিত আবার মোছলেম শিবিরে ফিরিয়া আসিবারও উপদেশ দিলেন।

পরদিন খালেদ মেষ-পালের উপর সিংহের ন্যায় গিয়া শত্রু-শিবিরে উপস্থিত হইলেন। রোমকগণ সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। দোভাষীর মারফতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। রোমক সেনাপতি বাহান যীশুর নাম করিয়া রোমান সম্রাটের গুণগান করিতে লাগিলেন। খালেদ বাহানের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমরা যাঁহাকে নেতৃ-পদে বরণ করিয়াছি, তিনি যদি মুহূর্ত্তেকের তরে তোমাদের সম্রাটের ন্যায় প্রভুত্বের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তন্মুহূর্ত্তেই আমরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ফেলিব।" অতঃপর বাহান পুনরায় রোমানদিগের অগণিত সৈন্য এবং অফুরন্ত ধনভাণ্ডারের বড়াই আরম্ভ করিলেন।

বাহানের কথা শেষ হইলে পর, হজরত খালেদ বা'দ হাম্‌দ ও না'ত বলিতে লাগিলেন,—"তোমাদের ধন-সম্পদ সৈন্য-সামন্ত এবং বিশাল সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আমরা সম্যক অবগত আছি। আমাদের সেই অজ্ঞতা ও গৃহ-বিবাদের কথাও বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অসীম করুণা, তিনি আমাদের নিকট শেষ-নবী প্রেরণ করিয়াছেন। নবী করিম আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—আল্লাহ্ তাআলার কোন অংশী নাই। তাঁহার স্ত্রীও নাই—সন্তানও নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। এই সত্য এবং এই বিশ্বাস জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহারা এই বিশ্বাস গ্রহণ করিবে তাহারা আমাদের সহোদর-প্রতিম। যাহারা

এই সত্য গ্রহণ না করিয়াও জিজিয়া দানে সম্মত হইবে, তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া আমরা তাহাদের সংরক্ষক হইব। যাহারা উভয় শর্ত্ত অস্বীকার করিবে, তাহাদের সহিত তরবারিই আমাদের সম্পর্ক স্থির করিবে।"

উত্তর শ্রবণে বাহানের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। "পরের নিকট জিজিয়া গ্রহণ করি—কাহাকেও জিজিয়া দিতে প্রস্তুত নহি।" এই বলিয়া সৈন্যদিগের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া সদম্ভে বলিল,—উহারা জিজিয়া দানাপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ মনে করে। উত্তর শুনিয়া খালেদ সবেগে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বাহান আপন সৈন্যদিগকে উস্কাইয়া ও উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। পাদ্রীগণ যীশুর জয়গানে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া আগে আগে চলিতে লাগিলেন।

পরদিন সকালে দুই লক্ষ রোমান-সৈন্যের বিপুল বাহিনী ত্রিশ সহস্র মোছলেম সৈন্যের প্রতি ভীষণ বেগে আক্রমণ চালাইল। আবু ওবায়দা, আমর বিন্ আ'ছ, শরহ্বিল এবং এজিদ বিন্ আবি-ছুফিয়ান প্রমুখ বীরগণ এক এক শ্রেণীর ভার লইয়া প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। নকীবগণ জেহাদের আয়াত তেলাওৎ পূর্ব্বক মোজাহেদীনকে মরণপণে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মেদিনী প্রকম্পিত করিয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর এবং প্রচণ্ড হইতে প্রচণ্ডতর আক্রমণ ও প্রত্যাক্রমণ চলিতে লাগিল।

ময়দানে জঙ্গ

প্রথমতঃ রোমান-সৈন্যগণ ভীষণ বেগে ধাবিত হইল। মোছলেম বাহিনীর প্রতি অজস্র তীর নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। সেই সঘন তীর বৃষ্টিতে হিমাচলও অচলভাবে তিষ্ঠিতে পারিত কি না সন্দেহ। কিন্তু

মোছলেম-বাহিনী এক পদও টলিল না। তৎপর রোমান-সৈন্যগণ তাহাদের প্রায় সমস্ত শক্তি লইয়া মোছলেম-বাহিনীর দক্ষিণ বাহুর একাংশে আক্রমণ চালাইতে লাগিল। ফলে হঠাৎ এই অংশে পদস্খলন হইল। রোম-সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে একেবারে তাঁবুর দ্বার দেশে ঠেলিয়া লইয়া গেল। এই দৃশ্য তাঁবুস্থিত মোছলেম-বীরাঙ্গনাদিগের পক্ষে একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা তাঁবুর খুঁটা-খুঁটি উৎপাটন করিয়া লইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—**"কোথায়, হে রণপলাতক কাপুরুষগণ! কোথায় চলিয়াছ? আর এক পদ পশ্চাদ্ধাবিত হইলে, তোমাদের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিব।"** সঙ্গে সঙ্গে নারী-কবি খওলা উদ্দীপনা-ব্যঞ্জক সুরে বীর-রসাত্মক গান গাহিয়া সৈন্যদিগকে যুগপৎ লজ্জিত ও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বীরাঙ্গনাদিগের এই ভাব দর্শন ও তিরস্কার শ্রবণে মোছলেম-বাহিনী মরিয়া হইয়া উঠিল। অন্তরে নব বলের সঞ্চার হইল। মআজ বিন্ জবল নয়ন-পুত্তলি-সম পুত্রকে লইয়া, পিতা-পুত্র একযোগে হাতে-প্রাণ ও দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিয়া একেবারে শত্রু-সৈন্যের বুকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভীষণ আক্রমণে শত্রু সৈন্যের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া গেল।

বাহুর অপরাংশে আরও সুন্দর দৃশ্য! শত শত মোছলেম-শির ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। শত শত বাহু চিরতরে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। শত শত বক্ষে তপ্ত রক্তের ফোয়ারা বহিতেছে। এরূপ শিরহীন, পদহীন ও বাহুহীন মোজাহেদীন অনন্ত জীবন ও অনন্ত সুখের আশায় উৎফুল্ল হইয়া, প্রাণ-বায়ুর নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে মহিমাময় আল্লাহ্ তাআলার জয় ও ধন্যবাদের গান গাহিতেছেন। আর রক্ত-ফাগুর উৎসব-দিবসে মরণ পণের উদ্বোধন জানাইয়া, সুস্থ মোজাহেদীনকে অছিয়ৎ করিতেছেন,—

"সাবধান! মোছলমানের নাম কলঙ্কিত করিওনা।"

হজরত খালেদ পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, এক এক জন মোছলেম-বীর অন্ততঃ দশ দশ জন রোমান-সৈন্যের প্রাণ সংহার করিয়া, শাহাদতের সুধা পানে অনন্ত জীবন লাভ করিতেছেন। এমন সময়ে তিনি আপন সৈন্যদল লইয়া, অন্যান্য শ্রেণী ভেদ করতঃ একেবারে সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি গিয়া দেখিলেন, আবু জেহ্লের পুত্র একরামা রোমান-সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"অসত্যের খাতিরে আল্লার নবীর সহিত যুদ্ধ করিতে যাহার পদস্খলন হয় নাই, আজ সত্যের, অনন্ত মঙ্গল ও অনন্ত জীবনের যুদ্ধে তাহার কি পদস্খলন হইবে?—হইতে পারে না।" এই বলিয়া আপন সহযোদ্ধাদিগকে বলিলেন, কে কে মরণের বায়াৎ করিবে? তখন চারি শত সহযোদ্ধা মরণের বায়াৎ করিলেন। কয়েক সহস্র শত্রু-সৈন্য বধ করিয়া, এই দলের প্রায় সকলেই শাহাদৎ লাভ করিয়াছিলেন। মহাবীর একরামাও ভীষণভাবে আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। হজরত খালেদ তাঁহার রাণের উপর একরামার শির ধারণ পূর্ব্বক, তাঁহার মুখে পানি দিতে লাগিলেন। একরামা শাহাদৎ লাভের জন্য গৌরব ও আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে বলিলেন, আমার শাহাদৎ সম্বন্ধে ওমরের সন্দেহ ছিল। আজ তাঁহার সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে।

যাহা হউক একরামা ও তাঁহার সহযোদ্ধগণ শহীদ হইয়াছিলেন বটে। কিন্তু "ছায়ফুল্লাহ" খালেদ বিন্ অলিদের ভীষণ ও প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে রোমান-সৈন্যগণ তিষ্ঠিতে পারিল না। তাহারা পশ্চাদ্ধাবন করিতে বাধ্য হইল। রোমান-সেনানায়কগণ এই দৃশ্য দেখিয়া, রুমালে চোখ

ঢাকিয়া লইল। তাহারা বলিল, এই চক্ষে জয় দেখিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, পরাজয় আর দেখিব না।

অন্যদিকে বাম বাহুর দৃশ্য আরও মনোহর! এই বাহুর একাংশে শামবাসী গচ্ছান কবিলারই লোক ছিল। রোমানের প্রভুত্বের ছাপ তাহাদিগের অন্তরে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা রোমানদিগকে দেখিয়া ভীত ও অভিভূত হইয়া পড়িল। শত্রুর আক্রমণে তাহাদের পদস্খলন হইল। একদল রোমান-সৈন্য তাহাদিগকে ঠেলিয়া তাঁবুর দ্বারে উপস্থিত করিল। "খিমার" মোছলেম-স্বেচ্ছাসেবিকাগণ তাহাদের অবস্থা দেখিয়া আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। বীরাঙ্গনাদিগের সাহস ও বিক্রম দেখিয়াই রোম-সৈন্যগণ আর সম্মুখে অগ্রসর হইল না। কিন্তু বাহুর অপরাংশ মরণপণে উদ্বুদ্ধ। তাহারা কিছুতেই টলিল না। তাহারা পণ করিল, জীবন থাকিতে পলায়ন করিব না। এই দৃঢ় পণ লইয়া কেয়াছ বিন্ আসিম, ছঈদ বিন জায়দ, এজিদ বিন্ আবি ছুফিয়ান, আমর বিন্ আছ, প্রমুখ বীরনায়কগণ "ধীরতা ও দৃঢ়তাই দুনিয়ার ইজ্জত আর আ'খেরতের রহমৎ" এই বলিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ছঈদ বিন্ জায়দ কর্তৃক শত্রুর সম্মুখ-শ্রেণীর নায়ক নিহত হইল। আর এজিদ পিতা আবু ছুফিয়ানের উৎসাহ বাণীতে উদ্বুদ্ধ ও তন্ময় হইয়া, অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। শরজিল অসংখ্য শত্রু-সৈন্যের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান। কোর্‌আন মজিদের আয়ৎ

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون *

পাঠ করতঃ না'রা দিতে লাগিলেন, "কোথায় আল্লার বেসাতিগণ,

আল্লার নৈকট্য ও কৈবল্য-লাভাকাঙ্ক্ষিগণ কোথায়?" এই না'রার হুঙ্কারে, বিচ্ছিন্ন মোছলেম-সৈন্যগণ সমবেত হইয়া ভীষণ প্রত্যাক্রমণে অগ্রসর হইল। পৃষ্ঠ-দেশে মোছলেম-রমণীগণ সহুঙ্কারে বলিতেছেন,—"সাবধান! যুদ্ধে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া, আমাদিগকে আর মুখ দেখাইওনা।"

সত্যের জয়

ফলে যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। অবশ্য তখনও জয় পরাজয়ের নিশ্চয়তা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। এমন সময়ে বীরবর কায়ছ বাম বাহুর পশ্চাত হইতে এবং ছঈদ বিন্ জায়দ মধ্য-শ্রেণী হইতে বহির্গত হইয়া, রোমান-দলের প্রতি এমন ভীষণ ও প্রচণ্ড আক্রমণ করিলেন যে, তাহারা আর তিষ্ঠিতে পারিল না। হতাহত রোমক-সৈন্যের পর্ব্বত-পরিমাণ স্তূপ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে রাখিয়া, রোমান সৈন্যগণ চিরতরে পলায়ন করিল। এই শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ আনৃতাকিয়ায় হারকলের নিকট পঁছিলে, শাম-দেশকে চির বিদায় দিয়া, তিনি কুস্তুন্তুনিয়া যাত্রা করিলেন।

য়্যারমুক-যুদ্ধে লক্ষাধিক রোমক-সৈন্য নিহত হইয়াছিল। কয়েকজন বড় বড় নায়ক সহ তিন সহস্র মোজাহেদ শহীদ হইয়াছিলেন। আহত-দিগের সংখ্যা অগণিত। মোজাহেদীনের বীরত্বের আভাস হাবাশ বিন্ কায়ছের পদবিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে। তাঁহার একখানা পা কাটিয়া কোথায় পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি ঘুণাক্ষরেও তাহা অবগত হন নাই। অবশেষে পা না দেখিয়া তাহার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

এদিকে খলিফা হজরত ওমর য়্যারমুকের সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত। এই সংবাদের জন্য তিনি নিদ্রা পরিহার করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন। এমন সময়ে আমির আবু-ওবায়দার "ফৎহে-নামা" লইয়া হজিফা বিন্

য়্যামান দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হজরত ওমর ফারুক "ফৎহে-নামা" পাইয়া, সর্ব্ব-বিজয়ের মালিক সর্ব্বসিদ্ধিদাতা আল্লাহ্-তাআলাকে ধন্যবাদ করিয়া, তাঁহারই উদ্দেশে ছজিদায় প্রণত হইয়া পড়িলেন। মোছলেম বিজয়োল্লাসের ইহাই বিশেষত্ব।

আবু-ওবায়দা য়্যারমুক ছাড়িয়া, আবার হামছ গেলেন। খালেদকে কন্‌ছরিন পাঠাইলেন। অল্প আয়াসে এই শহর জয় হইল। এখানকার অধিবাসিবৃন্দ পূর্ব্বেই এছলামের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকেই তাঁহার আগমনের বা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে এছ্‌লামে আত্মসমর্পণ করিল। আর যাহারা স্বেচ্ছায় এছ্‌লাম কবুল করিল না, মহাবীর তাহাদের ধর্ম্ম-স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহারা আর অধিক দিন অসত্যের আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না; মকরন্দলোভী মক্ষিকার ন্যায়, এছ্‌লাম অমৃত পান করিয়া, নব জীবন লাভে ধন্য হইল।

অতঃপর আবু-ওবায়দা হালব শহরের দিকে অগ্রসর হইলেন। হালব শহরের বহির্দ্দেশে বহু আরব বাস করিত। তাহারা প্রথমতঃ জিজিয়া দানে সম্মত হইয়া সন্ধি করিল। কিন্তু কিয়দ্দিন পরে মোছলমানদিগের সহিত ভাবের আদান প্রদান করতঃ তাহারা এছ্‌লামের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে এবং মুক্তির একমাত্র অবলম্বনরূপে এছলাম গ্রহণ করে। হালববাসী দুর্গ প্রাচীরে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। আয়াছ বিন্ গনম একদল সৈন্য লইয়া নগর বেষ্টন করিয়া রহিলেন। অল্পদিন মধ্যে হালববাসী জিজিয়া দানের সম্মতি প্রকাশে ধন-প্রাণ ও গির্জ্জার নিরাপদতা প্রার্থনা করিয়া আত্মসমর্পণ করিল। তদনুসারে চুক্তিপত্র প্রদত্ত হইল। তারপর আবু-ওবায়দা আন্তাকিয়া জয়ে মনোনিবেশ করিলেন। রোমান খৃষ্টানগণ বিভিন্ন বিজিত স্থান হইতে আসিয়া রাজধানী আন্তাকিয়ায় সমবেত হইয়াছিল। আবু-ওবায়দার আগমন-সংবাদে তাহাদের অন্তর

কাঁপিয়া উঠিল। আবু-ওবায়দা নগর বেষ্টন করা মাত্রই তাহারা সন্ধির প্রার্থনা করিল। অতঃপর মোছলেম-সৈন্য বাহিনীর পক্ষে আর যুদ্ধের আবশ্যকতা রহিল না। শান্তি ও সন্ধির সংবাদ বহন করিয়া, বাহিনী যে দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, সে দিকেই জয় জয়কার। হারকলের খৃষ্টান প্রজাগণ হয় এছলাম কবুল করিতে লাগিল, না হয় জিজিয়া দানে সম্মত হইয়া সন্ধি করিয়া মোছলমানের বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিল। এইরূপে বুকা, 'জুমা' তুজী, কুরছ; দলুক, রাবান, বলছ প্রভৃতি অতি অল্প দিনের মধ্যেই জয় হইয়া গেল। "জুমা"-বাসী জিজিয়া দানে অসম্মত হইয়া, সামরিক সাহায্যের জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। সুতরাং এই শর্তেই তাহাদের সহিত সন্ধি হয়। কিন্তু অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ জিজিয়া দানে সম্মত হইল ; তাহাদের সহিত তদনুসারেই সন্ধি হইয়া গেল।

বায়তুল-মোকদ্দছ-বিজয়



পাঠকগণ পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন যে, প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক মহাবাহু আমর বিন্ আ'ছকে ফেলিস্তিন অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে হামছ ও আরদন-বাহিনীর সাহায্যার্থ অধিক সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছিল বলিয়া, এযাবৎ তিনি ফেলিস্তিন বিজয়ে যথোচিত সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তথাপি এই অনিয়মিত যুদ্ধের দ্বারা ফেলিস্তিনের ছোট বড় অনেক শহর জয় করিয়াছেন। অপরাপর অঞ্চলের জয় হইলে পর, তিনি ফেলিস্তিন বিজয়ের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। অধিকন্তু হজরত আবু-ওবায়দা কন্নছরিন হইতে ফেলিস্তিন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মহাবাহু আবু-ওবায়দা বায়তুল-মোকদ্দছে পঁহুছিলে, খৃষ্টানগণ সন্ধির প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল। সন্ধির শর্ত্ত লইয়া কোন প্রকার মতভেদ হইল না। খৃষ্টানগণ শুধু এই নিবেদন জানাইল যে, স্বয়ং খলিফা হজরত ওমর ফারুক বায়তুল-মোকদ্দছে আসিয়া, যেন এই সন্ধি বা চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর করিয়া দেন। হজরত আবু-ওবায়দা খলিফার দরবারে সমস্ত বিবরণ লিখিয়া জানাইলেন। পত্র পাইয়া, হজরত ওমর ফেলিস্তিনবাসী খৃষ্টানদিগের অভিপ্রায় ছাহাবীদিগকে জানাইলেন। হজরত ওছমান বলিলেন, ইহা তাহাদের অন্যায় আব্দার

মাত্র। এই আবদার রক্ষার প্রয়োজন নাই। কিন্তু হজরত আলী ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। অধিকাংশ ছাহাবী হজরত আলীরই মত সমর্থন করিলেন। স্বয়ং ফারুকেরও ইহা পছন্দ হইল।

যাত্রা

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁহার অনুপস্থিতি-কালের জন্য হজরত ওছ্‌মানকে খেলাফতের ভার দিয়া, খলিফা ফারুক বায়তুল-মোকদ্দছ যাত্রা করিলেন। শামদেশের সেনাপতিদিগকে যাত্রার সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদিগকে জাবিয়া নামক স্থানে সাক্ষাৎকারের উপদেশ দিলেন। এজিদ-বিন্‌-আবি ছুফিয়ান, খালেদ-বিন্‌ অলিদ প্রমুখ সেনাপতিগণ জাবিয়ায় উপস্থিত হইয়া খলিফার অভ্যর্থনা করিলেন। খলিফা হজরত ওমর ফারুক জাবিয়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ জাঁক-জমক পূর্ণ; রং-বেরঙের কবা তাঁহাদের পরিধানে। "হরির" ও "দিবা" বস্ত্রে এই সকল কবা প্রস্তুত। এই দৃশ্য হজরত ওমরের চোখে কেমন কেমন ঠেকিল। আরবদিগের এই অনারব হাব-ভাব দেখিয়া, তিনি অশ্ব পৃষ্ঠে স্থির থাকিতে পারিলেন না, অবতরণ করিলেন। সেনাপতিদিগকে লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন,—আফ্‌ছোছ! তোমরা এত তাড়াতাড়ি অনারব অভ্যাস গ্রহণ করিয়া ফেলিলে?

হজরত ওমরের জাবিয়া-অবস্থান-সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। একদা হজরত ফারুক সৈন্য বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, অদূরে কতিপয় সশস্ত্র খৃষ্টান দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া জাবিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সশস্ত্র অশ্বারোহীদিগকে দেখিয়া, মোছলেম-সৈন্যদিগের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি হজরত ওমর অনুমান করিলেন, আক্রমণ তাহাদের উদ্দেশ্য নহে।

অভয়ানন্দ স্বরে মোছলেম-সৈন্যদিগকে বলিলেন,—"ভয় নাই, ইহারা নিশ্চয় শান্তি ও সন্ধি প্রার্থনা করিতেই আসিয়াছে।" অশ্বারোহিগণ খলিফার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, যথারীতি অভিবাদন জানাইয়া বলিলেন, তাঁহারা বায়তুল-মোকদ্দছের খৃষ্টান-প্রধান। খলিফার বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার চুক্তি-পত্র লাভেচ্ছায় তাঁহারা জাবিয়ায় আসিয়াছেন। শর্ত্ত আলোচিত হইল। চুক্তি-পত্র লিপিবদ্ধ হইল। (১) অতঃপর আরবের রাজা শামের সম্রাট হজরত ওমর ফারুক পদব্রজে জাবিয়া হইতে বায়তুল মোকদ্দছ যাত্রা করিলেন। বায়তুল-মোকদ্দছের নিকট উপস্থিত হইলে, মোছলমানগণ তাঁহার অভ্যর্থনায় অগ্রসর হইলেন। খলিফার পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহারা ভাবিলেন, খৃষ্টানদিগের অন্তরে প্রভাব বিস্তারের জন্য খলিফার পরিচ্ছদে কিছু জাঁক-জমক থাকা আবশ্যক। কেহ কেহ তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। কেহ কেহ উত্তম পোষাক আনিয়া খলিফার খেদমতে উপহার দিলেন। কিন্তু হজরত ওমর এই প্রস্তাব বা পোষাক গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—এছলামই আমার সম্মান, ইহাই যথেষ্ট—অন্য সম্মান নিষ্প্রয়োজন। বায়তুল-মোকদ্দছে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে মছজেদ পরিদর্শন করিয়া কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করেন। কিছুদিন বায়তুল-মোকদ্দছে অবস্থান করিয়া তথাকার শাসন ও সৈন্য-রক্ষার আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করেন।

(১) এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে জাবিয়ায় সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, বায়তুল মোকদ্দছেই স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। শর্ত্তাদির আলোচনা ও নির্দ্ধারণ যে জাবিয়ায় হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এরাক-বিজয়

শাম-বিজয়ের বিবরণে পাঠকগণ দেখিতে পাইয়াছেন যে, এরাক-বাহিনী আসিয়া, শাম-মোজাহেদীনের সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু এরাকে কখন এবং কিভাবে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার কোন আভাস আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেই নাই। প্রত্যেক বিজয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যাহাতে অল্পায়াসে পাঠকের হৃদঙ্গম হয়, তজ্জন্য তাহার বিবরণও আলাহেদা আলাহেদা করিয়া দিতেছি। পক্ষান্তরে শাম-বিজয়ের কারণ মূলতঃ তবুক ও মুতা যুদ্ধে উৎপন্ন বলিয়া, এরাক-বিজয়ের পূর্ব্বেই তাহা সন্নিবেশিত করিয়াছি। এইক্ষণ এরাক-বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক যখন শাম-অভিযানে সৈন্য চালনা করেন, তখন "আল্লার অসি" খালেদ বিন্ অলিদ আরবের আভ্যন্তরীণ অশান্তি দমনে নিয়োজিত ছিলেন। আল্লার রহমতে তিনি সেই অশান্তি দমন করিয়া ফেলিলেন। অন্যদিকে মোছন্নার প্রচার ফলে তাঁহার গোত্র এছলাম গ্রহণ করিয়াছে। অতঃপর এই দুই মহাবীর খলিফার অনুমতি লইয়া এরাক-সীমান্ত আক্রমণ করেন। মহাবীর খালেদ এরাকের সীমান্ত প্রদেশ সমূহ অধিকার পূর্ব্বক কূফার অনতি দুরে "হিরা" পর্য্যন্ত বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। এমন সময়ে

হিজরী ত্রয়োদশ সালের রবিউল আ'খের মাসে, খলিফার আদেশক্রমে তিনি শাম যাত্রা করেন। মোছন্না এরাকে রহিলেন বটে, কিন্তু বিজয়ের বিস্তৃতির প্রতি মনোনিবেশ করা তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। কাজেই এরাক বিজয় সাময়িকভাবে স্থগিত রহিল।

হজরত ওমর ফারুক খেলাফতের গুরু দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াই, এরাক বিজয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। এই দায়িত্ব-ভার গ্রহণ কালে প্রতিনিধি সম্মিলনে যে উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা শ্রবণে আবু-ওবায়দ ছকফী এরাক-অভিযানের নেতৃত্ব-ভার লইতে প্রস্তুত হইলেন। আবুওবায়দ মোছলেম-বাহিনী গঠন করতঃ এরাকে অভিযান করিলেন।

মোছলেম-বাহিনীর অভিযান-সংবাদ কিছ্‌রার দরবারে পঁহুছিল। হজরত খালেদের আক্রমণের সময় হইতে তাহারা প্রস্তুত হইতেছিল। আবু-ওবায়দের অভিযানের খবর পাইয়া, সমগ্র দেশে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। সম্রাট ইউনান-দখ্‌ৎ খোরাছানের শাসনকর্ত্তা রোস্তমকে উজিরে-হর্‌ব বা সমর-সচীব মনোনীত করিলেন।

রোস্তম বিশেষ আয়োজনে লিপ্ত হইলেন। যুদ্ধায়োজনের সঙ্গে সমগ্র এরাক দেশে প্রচারক পাঠাইয়া এরাকবাসীকে স্বধর্ম্মের নামে প্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। আরবের জাত শত্রু জাপানকে সেনাপতি করিয়া এক বিপুল বাহিনী এরাকের দিকে প্রেরণ করিলেন। রোস্তম স্বয়ং আর এক দলের সেনাপতিরূপে মোছলেম-বাহিনীর সন্ধানে চলিলেন। ইতিমধ্যে আবু-ওবায়দের বাহিনী হিরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হিরায় পঁহুছিয়া আবু-ওবায়দ নমারেকই যুদ্ধস্থান মনোনীত করিলেন। নমারেকে আসিয়া উভয় শ্রেণী পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইল। ভীষণ যুদ্ধের পর জাপান ধৃত হইলেন। কিন্তু জাপান আত্মপরিচয় গোপন করতঃ মুক্তি-পণ দিয়া রেহাই

পাইলেন। অতঃপর আবু-ওবায়দ কস্করের দিকে অভিযান করিলেন। ছকাতিয়া যুদ্ধে শত্রু-সৈন্য পরাস্ত হইল। ফলে ছোট বড় অনেক ছরদার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

এই পরাজয়ের পর রোস্তম বিপুল উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া "বীর বাহ্মন" মরওয়ান শাহ্কে বিশাল বাহিনীসহ মরূহা প্রেরণ করিলেন। মরওয়ান শাহ মরূহায় আসিয়া, মোছলেম বাহিনীর সম্মুখীন হইল। দুই শ্রেণীর মধ্যে এক নহর ব্যবধান ছিল। মরওয়ান শাহ নহর পারে থাকিয়া মোছলেম-বাহিনীকে আহ্বান করিলেন। আবু-ওবায়দ এই আহ্বান পাইয়া, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আবু-ওবায়দ বলিলেন, অগ্নি-পূজক মজুছী আমাদিগকে এমনই ভাবে আহ্বান দিবে আর আমরা সেই আহ্বানে সংগ্রামে অগ্রসর হইব না, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই বলিয়া নৌকা দিয়া ঐ নহরে পুল নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। পুল প্রস্তুত হইল, মোছলেম-সৈন্য পুলের উপর দিয়া নহর পার হইল বটে, কিন্তু ব্যূহ রচনার উপযুক্ত স্থান মিলিল না। মরওয়ানের বাহিনী হাতী লইয়া ভীষণ ভাবে মোছলেমদিগকে আক্রমণ করিল। হাতীর সম্মুখে ঘোড়ার আক্রমণ ব্যর্থ হইতে লাগিল দেখিয়া, আবু-ওবায়দ স্বয়ং অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া সমস্ত সৈন্যকে পায়দল লড়িবার হুকুম দিলেন। মোছলেম-সৈন্যগণ হাওদার রসি কাটিয়া দিয়া, অশ্বারোহি-দিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। হজরত আবু-ওবায়দ সেনাপতির শ্বেত-হস্তীর শুঁড়ে তরবারির আঘাত করিলেন। শুঁড় কাটা গিয়া ভূলুণ্ঠিত হইল। কিন্তু সেই মত্ত মাতঙ্গের আক্রমণ হইতে তিনি আত্ম রক্ষা করিতে পারিলেন না। সেই হস্তীর দ্বারা পদদলিত হইয়া, তিনি শাহাদৎ-নছিব হইলেন।

আবু-ওবায়দের শাহাদতের পর, তাঁহার সহোদর হাকম পতাকা

উত্তোলন করিয়া সেই শ্বেত-হস্তীর প্রতি আক্রমণ করিলেন। তিনিও সহোদর আবু-ওবায়দের দশা প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে একে একে সাত জন বীর-সেনাপতির শাহাদতের পর, মোছন্না আসিয়া ঝাণ্ডা বোলন্দ করিলেন। ইতিমধ্যে পুল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে মোছলেম-সৈন্যগণ আর অপর পারে না যাইতে পারে। অবশেষে মোছন্না এমননই সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধারম্ভ করিলেন যে, শত্রু-সৈন্যের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া গেল। মোছন্নার আদেশে পুল পুনর্নির্ম্মিত হইল। খলিফার দরবারে সমস্ত সংবাদ প্রেরিত হইল। নয় হাজারের মধ্যে ছয় হাজার রোম-সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। (রমজান, ১৩ হিঃ)

বোয়েবযুদ্ধ

মোছন্নার পত্র খলিফার দরবারে পঁহুছিল। খলিফা হজরত ওমর ফারুক পত্রে জানিতে পারিলেন, আবু-ওবায়দ, আবু-জায়দ আনছারী প্রমুখ বীর বৃন্দ শাহাদৎ লাভ করিয়াছেন; অতিরিক্ত সৈন্যবলের আবশ্যক। খলিফা আরবের চতুর্দ্দিকে নকীব ও প্রচারক পাঠাইয়া সৈন্য সংগ্রহে মনোযোগ দিলেন। ফলে আরবময় বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। আরবের খৃষ্টানগণ খলিফার দরবারে আসিয়া বলিতে লাগিল, আজ আমরা আমাদের জাতিকে সংগ্রামে পাঠাইয়া, নীরবে বসিয়া থাকিতে পারিব না; আমরাও জাতির সহযাত্রী হইব। অন্যদিকে মোছন্না স্বয়ং নবদীক্ষিত মোছলমান ও অন্যান্য এরাক সীমান্তবাসী হইতে সৈন্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন। অবশেষে দুই বাহিনী সম্মিলিত হইয়া কুফার নিকটবর্ত্তী বোয়েব নামক স্থানে সমবেত হইল।

পারস্য সম্রাট পুরান-দখৎ মোছলমানদিগের আয়োজন সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত যথারীতি গুপ্ত চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মোহ্রানের অধিনায়কত্বে

দ্বাদশ সহস্র সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করিলেন। পারশ্য-বাহিনী ফোরাৎ নদী পার হইয়া মোছলেম বাহিনীর প্রতি আক্রমণ করিল।

মোছন্না আপন সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত করিলেন। এছলামী যুদ্ধের কায়েদা এই যে, সেনাপতি "আল্লাহো আক্‌বর" বলিয়া না'রা দিলে সৈন্যগণ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইবে। দ্বিতীয় না'রায় অস্ত্রোত্তলন করতঃ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইবে। তৃতীয় না'রায় আক্রমণ করিবে। কিন্তু সেনাপতি মোছন্না দ্বিতীয় বার "আল্লাহো আক্‌বর" ধ্বনি না উচ্চারণ করিতেই, ঈরাণী সৈন্যগণ ভীষণ বেগে মোছলেম-বাহিনীর প্রতি আপতিত হইল। মোছলেম-সৈন্যগণ সেনাপতির আদেশের জন্য স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারাও প্রত্যাক্রমণে অগ্রসর হইল। মোছন্না সহুঙ্কারে বলিয়া উঠিলেন,— "সাবধান! এছলামকে কলঙ্কিত করিও না।" মোছন্নার সাবধান বাণীতে সৈন্যগণ আবার যথাস্থানে সারিতে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর যথারীতি সেনাপতির আদেশে মোছলেম-সৈন্যগণ বিপুল বিক্রমে ঈরানী সৈন্যের প্রতি প্রত্যাক্রমণ করিল। মোছন্না আপন বাহিনীর খৃষ্টান-সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা খৃষ্টান হইলেও আমাদের স্বজাতি। জাতির সম্মান রক্ষার্থ বাহুতে বাহু মিলাইয়া দাঁড়াও।"

মোছলেম-বাহিনীর আক্রমণে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, প্রথমতঃ ঈরাণী সৈন্যের পদস্খলন হইল। কিন্তু মোহ্‌রানের বিশেষ কৌশলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, মোছলেম-বাহিনীকে আবার ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে মোছন্নার সহোদর মছ্‌উদ আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। সহোদরের আসন্ন শাহাদতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া, মোছন্না বলিতে লাগিলেন,— "যাঁহাদের সম্মান-জ্ঞান আছে, তাঁহারা এমনই ভাবে জীবন দান করেন।" আর মুমূর্ষ বীর মছ্‌উদ বলিতেছেন,—"আমার জানের খরি-

দার যিনি, তাঁহারই সন্ধানে চলিলাম। খবরদার, তোমরা সাহস হারাইওনা।” কিয়ৎক্ষণ পরে ঈছাই-ছরদার আনছ বিন্ হেলাল আহত হইলেন। মোছন্না দেখিবা মাত্র অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বুকে ধরিয়া ভ্রাতা মছউদের পার্শ্বদেশে শায়িত করিয়া রাখিলেন। কিন্তু মোছলেম-বাহিনীর এতৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইল। ফলে ঈরাণের সুপ্রসিদ্ধ বীর শহরবর্রাজ ও সেনাপতি মোহ্রানে নিহত হইলেন। সেনাপতির নিধন-প্রাপ্তিতে শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

বীর মোছন্না একদা বলিয়াছিলেন,—“এছলাম গ্রহণের পূর্ব্বেও আমি ঈরাণী সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। মোছলেম-সৈনিকরূপেও তাহাদের সহিত বল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমি বিশেষরূপে অনুভব ও অনুধাবন করিয়াছি যে,—“এছলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শত আ’জমী হাজার আরবের সমান ছিল। এছলাম গ্রহণের পর সেই আরবদিগের এক এক জন দশ দশ জন ঈরাণী সৈন্যাপেক্ষা অধিকতর বলীয়ান হইয়াছে।”

বিদ্রোহ

ঈরাণী সৈন্যের এই শোচনীয় পরাজয় সংবাদ ঈরাণী দরবারে পঁহুছিল। দরবারীগণ পূরানদখ্তকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎস্থলে এজ্দগেদ্কে তখ্তে বসাইলেন। পারস্যের দুই মহাবীর রোস্তম ও ফিরোজ হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে মোছলমানের বিজিত রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সুতরাং অল্পায়াসেই তাঁহারা হৃত রাজ্যে পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইলেন।

কাদেছিয়া মহাসমর

توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے
آساں نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا

খলিফার দরবারে এই সমস্ত সংবাদ আসিয়া পঁহুছিল। হজরত ওমর ফারুক তৎক্ষণাৎ মোছন্নাকে এক পত্র লিখিলেন; সসৈন্যে পিছাইয়া আরব-সীমান্তে আড্ডা স্থাপনের পরামর্শ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য সংগ্রহের আয়োজনে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু হজের সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া, তিনি হজব্রত উদ্‌যাপনে যাত্রা করিলেন। হজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া হজরত আলীকে তাঁহার অনুপস্থিতি-কালের জন্য খেলাফতের ভার অর্পণ করতঃ তিনি স্বয়ং সেনাপতি হইলেন। খলিফার সেনাপতিত্ব গ্রহণে মোছলেম সৈন্যদিগের মধ্যে বিপুল রণোন্মাদনার সঞ্চার হইল। রণোন্মত্ত সৈন্যদিগকে লইয়া মদিনা ত্যাগ করতঃ হজরত ওমর মধ্যপথে ছরারে উপস্থিত হইলেন। এইখানে পঁহুছিয়া ছাহাবীগণ স্থির করিলেন, আমিরুল মোমেনীনের পক্ষে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া সমীচীন নহে সুতরাং ছা'দ বিন্ আবি অকাছের অধিনায়কত্বে মোছলেম-বাহিনীকে মোছন্নার সাহায্যার্থ প্রেরণ করা হইল। যাত্রার পূর্ব্বে হজরত ওমর ছা'দকে মদিনা হইতে এরাক পর্য্যন্ত বিভিন্ন মঞ্জিলের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ব্যূহ-রচনা ও আক্রমণ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান উপদেশ দান করিলেন এবং পরেও বরাবর উপদেশ দান করিয়া আহ্‌কাম পাঠাইতেন।

এই সময়ে মোছন্না সসৈন্যে জিকারে অবস্থান করিতেছিলেন। ছা'দের সৈন্য-দল কূফার নিকটবর্ত্তী ছা'লবা নামক স্থানে পঁহুছিয়াছে বলিয়া, তিনি সংবাদ পাইলেন। গত যুদ্ধে আহত হইয়া, মোছন্না অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে আসা সম্ভব হইল না। আবশ্যক সংবাদাদি সহ সহোদর মোআন্নাকে ছা'দের নিকট প্রেরণ করিলেন। খলিফার পূর্ব্ব উপদেশানুসারে, ছা'দ সৈন্য-সংখ্যা, রসদের হিসাব ও যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা সবিস্তার লিখিয়া তাঁহাকে জানাইলেন। খলিফার ফরমান অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর ভার বিভিন্ন মোছলেম-বীরের উপর ছোপর্দ্দ করিলেন।

পারশ্য-দরবারে মোছলেম-দূত

হজরত ওমর ফারুক সেনাপতি ছা'দকে ফরমানের দ্বারা জানাইলেন,—এছ্‌লামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া, মজুছীদিগকে এছলামের প্রতি আহ্বান কর। তদনুসারে ছা'দ পারশ্যের রাজধানী মোদায়েনে একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। প্রতিনিধিগণ অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক ক্ষিপ্র ও দ্রুত গতিতে গিয়া, পারশ্যের রাজ-দরবারে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট এজ্‌দগের্দ সসম্মানেপ্রতিনিধিবর্গের অভ্যর্থনা করিলেন।

ঈরাণীগণ একে মজুছী, তার উপর সংশয়-বাদী। সম্রাট এজ্‌দগের্দ কথোপকথনে "চাবুকের" আরবী কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। মোছলেম প্রতিনিধি উত্তর দিতে না দিতেই, সম্রাট আরবী سوط শব্দকে ফারছী سوخت মনে করিয়া, তাহার অর্থ করিলেন,—"পারশ্যের সর্ব্বনাশ!" প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের কি উদ্দেশ্য, বল?" না'মান বিন্ মক্‌রণ সংক্ষেপে এছলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া, এছলাম গ্রহণের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। প্রত্যুত্তরে সম্রাট বলিলেন,—তোমরা কি ভুলিয়া

গিয়াছ যে, তোমরা দুনিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি? এই প্রশ্নের উত্তরে মুগীরা বিন্ জর্'ারা উঠিয়া বলিলেন,—"সত্য বটে, আরবগণ ভ্রান্ত ছিল। তাহারা আত্মকলহে লিপ্ত ছিল। জীবন্ত কন্যা-শিশু সমাধিস্থ করিয়া ফেলিত। কিন্তু আল্লার অপার কৃপা, তিনি আমাদিগের নিকট তাঁহার পয়গম্বর পাঠাইয়াছেন। এই বিশ্ব-পয়গম্বর মানে সম্মানে এবং বংশ-গৌরবে আমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমরা জানিতাম, তিনি চিরসত্যবাদী। তথাপি আমরা প্রথম প্রথম তাঁহার কথায় কর্ণপাত করি নাই। তাঁহার যথোচিত কদর মর্য্যাদা করি নাই। তিনি সত্য বলিতেন, আমরা মিথ্যা করিয়া ধরিতাম ও বুঝিতাম। তিনি উন্নতির দিকে আহ্বান করিতেন; আমরা অবনতির দিকে চলিয়া যাইতাম। কিন্তু ক্রমে আমাদের সেই ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। তাঁহার প্রচারিত সত্য আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে; তিনি যাহা বলিতেন খোদার আদেশে—তিনি যাহা করিতেন আল্লার অনুজ্ঞায়। তিনি আমাদিগকে সমস্ত দুনিয়ার সম্মুখে এছলামের সত্য উপস্থাপিত করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছেন। যাহারা এই সত্য গ্রহণ করিবে, তাহারা সর্ব্ব বিষয়ে আমাদের সমান। যাহারা এছলাম গ্রহণ না করিয়াও জিজিয়া দানে সম্মত হইবে, তাহারা আমাদের সন্ধিবদ্ধ মিত্র। আর যাহারা "এছলাম গ্রহণ ও জিজিয়া দান" উভয় অস্বীকার করিবে, তাহাদের জন্য নিষ্কোষিত অসি।"

কথোপকথন শেষ হইল। সম্রাটের আদেশে এক দলা মাটী আনীত হইল এবং প্রভুত্ব-স্বীকারের নিদর্শন স্বরূপ প্রতিনিধি দলের প্রধান আ'ছেম বিন্ ওমরের মস্তকে সেই মাটীর দলা ধারণ করা হইল। মোছলেম প্রতিনিধিগণ বিনা যুদ্ধে এরাক ও পারস্য বিজয়ের সংবাদ লইয়া, আমির ছা'দ বিন্ আবিঅকাছের নিকট উপস্থিত হইলেন।

যুদ্ধারম্ভ

পারশ্য-সম্রাট এজ্‌দগের্দ শেষ পর্য্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না, রোস্তমকে অভিযানে প্রেরণ করিলেন। ষাট হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী লইয়া, রোস্তম কাদেছিয়ায় অবতীর্ণ হইলেন। সেনাপতি ছা'দের নিকট সন্ধির পয়গাম পাঠাইলেন। সন্ধির শর্ত্ত আলোচনার নিমিত্ত মোছ্‌লেম-শিবির হইতে রোবঈ বিন্‌ আ'মের প্রেরিত হইলেন। বিশেষ ধূমধামের সহিত দরবার রচিত হইল। নির্ভীক বীর রোবঈ সেই দরবারে রোস্তমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতি সংক্ষেপে, মখ্‌লুকের বদলে খালেকের এতাবদৎ কায়েম হউক," সৃষ্ট জীবের পরিবর্ত্তে স্রষ্টার পূজা প্রতিষ্ঠিত হউক—বলিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু সন্ধি বিষয়ের কোন মীমাংসা হইল না। পরে পত্রের আদান প্রদান চলিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে মুগীরা মোছলেম-দূতরূপে রোস্তমের দরবারে উপস্থিত হইলেন। রোস্তম পাত্রমিত্র বেষ্টিত হইয়া, উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আ'ছেন। এমন সময়ে মুগীরা দরবারে প্রবেশ পূর্ব্বক একেবারে রোস্তমের পার্শ্বে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মুগীরার বে-পরওয়া-ভাব দেখিয়া দরবারে অপূর্ব্ব বিরক্তির সঞ্চার হইল। মুগীরা দরবারীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—একজন মানুষ স্বয়ংসিদ্ধ "খোদা" হইয়া বসিবে, আর অপরাপর লোক তাহারই দাসানুদাসরূপে প্রণত শির হইয়া থাকিবে, "এই দৃশ্য আমাদের নিকট অসহ্য। রোস্তম নানা কথায় মুগীরাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। অর্থ লোভ দেখাইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু মুগীরা অকুতোভয়ে বলিতে লাগিলেন,—"এছ্‌লামে আত্মসমর্পণ কর অথবা

জিজিয়া দানে সম্মত হও। অন্যথায় তোমাদের ও আমাদের সম্বন্ধের মীমাংসা, এই তরবারিই করিবে।" ফলে সন্ধির সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। ঝন্ ঝন্ ও ঝম্ ঝম্ শব্দে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল।

এওমুল আর্মাছ

রোস্তম বিশেষ সাবধানতার সহিত হস্তী ও অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যদিগের ব্যূহ রচনা করিলেন এবং পর দিন প্রত্যূষে মোছলেম বাহিনীর প্রতি ভীষণ আক্রমণ করিলেন। ছা'দ অসুস্থতা নিবন্ধন কাদেছিয়ার কোন প্রাচীন শাহী মহলে অবস্থান করিতেছিলেন। খালেদ বিন্ আর্ত্তফাকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলেন। কিন্তু ছা'দ বালাখানায় থাকিয়া এশারা-ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে পরিচালন করিতেন। অথবা আবশ্যক উপদেশ সমূহ কাগজে লিখিয়া, সেই কাগজের গুলি পাকাইয়া খালেদের প্রতি নিক্ষেপ করিতেন। প্রথমতঃ একজন ঈরাণী বীর দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান দিলেন। আমর মা'দী করব তাঁহার মোকাবেলায় অগ্রসর হইলেন। আমরের অসি-ফলকের আঘাতে সেই ঈরাণী বীরের শির শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া, ক্রিড়া কন্দুকের ন্যায় মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। অতঃপর ইরাণী হাতী-ছওয়ারগণ অগ্রসর হইল। হাতীর আক্রম,ণর সম্মুখে ঘোড়ার আক্রমণ ব্যর্থ হইতে লাগিল। কিন্তু মোছলেম সৈন্যগণ তীর ও তরবারির দ্বারা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সারা দিনের যুদ্ধের পর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে, উভয় বাহিনী আপন আপন শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হিঃ ১৪ সাল।)

এওমুল আগ্ওয়াছ।

পর দিন দিক্ দিগন্ত কাঁপাইয়া আসিয়া, শামের ছয় হাজার মোজাহেদীন এরাকে ছা'দের বাহিনীর সহিত যোগদান করিলেন। প্রথমতঃ বীর কেশরী কা'কা'র সহিত ঈরাণের সুপ্রসিদ্ধ বীর বাহ্মনের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাহ্মন নিহত হইলেন। তারপর দুই পক্ষে তুমুল সংগ্রাম শুরু হইল। ভীষণ যুদ্ধের পর দশ সহস্র ঈরাণী সৈন্য হতাহত হইল। মোছলেম বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা দুই হাজার। কিন্তু জয় পরাজয়ের কোন কুল-কিনারা হইল না।

এওমূল-আগওয়াছে আবু-মাহ্জন ছাকফীর ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মদ্যপানের অপরাধে আবু মাহ্জন বন্দী ছিলেন। সহযোদ্ধৃবৃন্দের অস্ত্র চালনা তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইলে, আ'বু-মাহ্জনের বীর হৃদয় নাচিয়া উঠিল। ছা'দের সহধর্ম্মিণী বিবী ছলমীকে অনুনয় বিনয় করিয়া তিনি বন্ধনমুক্ত হইলেন। ছা'দের বিশেষ ও নির্দ্দিষ্ট অশ্ব আরোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া অসংখ্য শত্রু বধ করিলেন। যুদ্ধের পর ফিরিয়া আসিয়া, আবার শৃঙ্খল পরিধান করিলেন। আবু মাহ্জনের এই আনুগত্য ও বীরত্বের সংবাদ ছা'দের কর্ণগোচর হইল। ছা'দ তাঁহাকে মুক্তি দান করিলেন। আবু-মাহ্জনও চির জীবনের মত মদ্যপানে তওবা করিলেন

এওমুল আমাছ

তৃতীয় দিবস শাম-দেশ হইতে আর এক দল মোজাহেদীন আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাদের অগমনে এবং শাম-বিজয়ের সংবাদে এক দিকে যেমন ছা'দের বাহিনীতে নববল নবোদ্যম ও নববিক্রমের সঞ্চার হইতে

লাগিল অন্য দিকে তেমনই ঈরাণ-বাহিনীর বল ও সাহস হ্রাস পাইতে লাগিল। মোছলেম-সৈন্যগণ আরবী উষ্ট্রকে বোর্কা পরাইয়া, অদ্ভুত জীবরূপে ঈরাণী অশ্বের সম্মুখে উপস্থিত করিল। পক্ষান্তরে হস্তীর চক্ষু উৎপাটন ও শুণ্ড কর্ত্তনের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিল। এরূপ বিপুল ও অতুল বিক্রমে শত্রু সৈন্যের উপর আপতিত হইল যে, শত্রু সৈন্য সেই ভীষণ আক্রমণের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। পলায়নপর রোস্তম নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বীর হেলালের অসি ফলকে রোস্তম সেই নদীতেই নিহত হইলেন। কাদেছিয়ার যুদ্ধে এছলামের জয় হইল।

ھم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے
پورے ھوئے جو وعدے کئے تھے حضور نے
(اخرجوالیہود والنصارے من جزیرۃالعرب)

ফৎহে নামা

ছা'দ বিজয়-সংবাদ লিখিয়া খলিফার দরবারে কাছেদ প্রেরণ করিলেন। হজরত ওমর ফারুক কাদেছিয়ার সংবাদের জন্য এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, তিনি প্রতি প্রত্যূষে কাছেদের উদ্দেশে মদিনা মোনওয়ারা হইতে কাদেছিয়ার পথে অনেক দূর চলিয়া যাইতেন। যে দিন কাদেছিয়া বিজয়ের সংবাদ লইয়া কাছেদ দারুল-খেলাফতে আসিতেছিলেন, সেই দিনও হজরত ফারুক কাদেছিয়ার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। কাছেদ "ফৎহে নামা" লইয়া উষ্ট্রারোহণে মদিনা আসিতেছে, এমন সময়ে পথিমধ্যে হজরত ওমরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। কাছেদ উষ্ট্র পৃষ্ঠে; আর হজরত ওমর তাহার পার্শ্বে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া কাদেছিয়া-বিজয় সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মদিনার নিকটবর্ত্তী হইলে, লোকের মুখে

শুনিয়া কাছেদ জানিতে পারিলেন, তিনি স্বয়ং আমিরুল-মোমেনীন। কাছেদ সলজ্জভাবে সেই অনিচ্ছাকৃত গোস্তাখীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। উত্তরে হজরত ফারুক বলিলেন,—"কিছু মনে করিও না। বল—আমাকে কাদেছিয়া-বিজয়ের সংবাদ বল।" অনন্তর মোছলেম মণ্ডলীর এক সভা হইল। এই সভায় হজরত ফারুক খেলাফতের ব্যাখ্যা করতঃ যে খোৎবা দান করিয়াছিলেন, ইন্‌শাআল্লাহ তাহা অন্যত্র উদ্ধৃত হইবে।

রাজধানী-অধিকার

পলাতক পারশিক সৈন্যগণ অতঃপর বাবুলে গিয়া সমবেত হইল। নূতন নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ সংগ্রহ করিয়া পারশিকগণ আবার প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইল। ছা'দের অদম্য বাহিনীও মধ্য পথে বোর্‌ছের সামন্ত রাজা বোস্তামকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়া, বাবুলে উপস্থিত হইল। তুমুল যুদ্ধের পর শত্রু সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া, ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিছু দিন পরে মোছলেম সৈন্যের মোকাবেলার জন্য সেই বিক্ষিপ্ত পারশিক সৈন্যগণ কুছীতে গিয়া জড় হইল। কুছীতেও শত্রুর পরাজয় ঘটিল; সেনাপতি শহর-এয়ার নিহত হইলেন।

পাপিষ্ঠ নমরুদ হজরত এবরাহিম আলায়হেছ্‌ছালামকে এই কুছীতেই বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। যুদ্ধাবসানে হজরত ছা'দ এবরাহিম নবীর কারাগারের চিহ্নসমূহ দর্শন করিলেন এবং সেই কুছী অধিকারে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া, খোদাওন্দ করিমকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

তদনন্তর "বাহ্‌রা-শের" নামক স্থানে যুদ্ধারম্ভ হয়। ইহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব্যাঘ্র-যুদ্ধ। পারশিকদিগের একটী পোষা বাঘ ছিল। তাহারা সেই ব্যাঘ্রকে মোছলেম-বাহিনীর প্রতি লেলাইয়া দিল। সিংহ হাশেম সেই ভীষণ ব্যাঘ্রকে তল্‌ওয়ারের এক কোপে নিঃশেষ করিয়া

ফেলিলেন। কয়েক সহস্র পারশিক সৈন্য বন্দী হইল। ছা'দ তাহাদের নাম ধামের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া, তাহাদিগকে মুক্তি দান করিলেন। বাহ্‌রা-শেরও অধিকৃত হইল।

দিজ্‌লা নদীর এক পারে বাহ্‌রা-শের, অপর পারে রাজধানী মোদায়েন। বাহ্‌রা-শেরের পতনের পর মোছলেম বাহিনীর আক্রমণের ভয়ে পারশিকগণ অপর পারে গিয়া, নদীর সমস্ত সেতু বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে এবং সমস্ত খেয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। **"মোছলেম ভ্রাতৃগণ! শত্রুগণ পরাজিত হইয়া এইক্ষণ নদীর আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিতেছে। কাল বিলম্ব না করিয়া শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন কর।"** এই বলিয়া, **সেনাপতি ছা'দ অশ্ব সহ সেই উদ্বেলিত খরস্রোতা দিজ্‌লা নদীতে ঝম্প প্রদান করিলেন। শ্রেণীর সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া সমস্ত বাহিনী সেনাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিল।** পারশিক সেনাপতি খরজাদ সসৈন্যে কূলে থাকিয়া মোছলেম বাহিনীর প্রতিরোধের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অদম্য মোছলেম বাহিনীর সম্মুখে তাহারা তিষ্ঠিতে পারিল না। دیو آمدہ اند . دیو آمدہ اند "দেও আসিয়াছে", "দেও আসিয়াছে" বলিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ফলে পারশ্যের রাজধানী মোদায়েন মোছলেম করতলগত হইল।

শুক্রবারেই মোদানে অধিকৃত হইয়াছিল। পারশ্যের রাজদর-বারে প্রবেশ করিয়া, মোছলেম বাহিনী জুম্‌আর নমাজ সমাপন করিলেন। (হিঃ ১৫ সাল।)

কেয়ানী ও ছাছানী সম্রাটগণের বহুকালের সঞ্চিত সমস্ত রত্নরাজি মোছলেম সৈন্যদিগের হস্তগত হইল। হরমুজ ও কোব্বাদের 'খঞ্জর' আর

নওশেরওয়ার "তাজ" মোছলেম পদলুণ্ঠিত হইয়া ধন্য হইল পারস্য সম্রাটের এয়াকুৎ-খচিত "স্বর্ণাশ্ব" ও "রজতুষ্ট্র" এবং পারস্য দরবারের বাহার "বাহার" ফরশ মোছলেম-পদ চুম্বনে কৃতার্থ হইল।

পারস্যের সেই অমূল্য মণি মুক্তার প্রতি কোন পদাতিক সৈন্য পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিল না। আমিরের আদেশ ব্যতিরেকে সেই জওয়াহেরাত কোন সৈনিক স্পর্শ করে নাই। সমস্ত মণি মাণিক্য যথা স্থানে রক্ষিত ছিল। অবশেষে সেনাপতি যথারীতি হিসাব নিকাশ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট অংশ দারুল-খেলাফতে প্রেরণ করেন। ধন্য মোজাহেদীন! ধন্য তোমাদের সংযম ও সম্বরণ!!

জলুলা বিজয়

ঈরাণী সেনাপতি খরজাদ মোদায়েন পরিত্যাগ করিয়া, সসৈন্যে সুরক্ষিত জলুলা দুর্গে উপস্থিত হইলেন। মোছলেম বাহিনী দুর্গ অবরোধ করিলেন। মাঝে মাঝে খণ্ড যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে শেষ যুদ্ধে লক্ষাধিক ঈরানী সৈন্য নিহত করিয়া মোছলেন বাহিনী জলুলা অধিকার করিলেন। (হিঃ ১৬ সাল।)

হালোয়ান অধিকার

বাহ্‌রা-শেরে যখন ভীষন যুদ্ধ চলিতে ছিল, তখন সম্রাট এজ্‌দগের্দ রাজধানী মোদায়েন পরিত্যাগ করতঃ হালোয়ানে আসিয়া অবস্থান করিতে ছিলেন। মোছলেম সৈন্যদিগের জলুলা অধিকারের সংবাদ পাইয়া, সম্রাট এই স্থান পরিত্যাগ করেন। সোপতি খছ্‌রু-শনুমকে হালোয়ান রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। সেনাপতি পরাজিত হইলেন, হালোয়ানে বিভিন্ন সামন্ত রাজা ও অন্যান্য প্রধান, জিজিয়া দানে সম্মত হইয়া এছলামের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ফারুকের রোদন

পারস্য-কুবের দীর্ঘকালের সঞ্চিত ধন গনিমতরূপে দারুল-খেলাফতে আনিয়া স্তূপাকারে রক্ষিত হইল। সেই অতুল, অগণিত ও অপরিমিত রত্নরাজি ও ধনরাশি দেখিয়া, খলিফা হজরত ওমর ফারুক হঠাৎ ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন,—ধনে প্রেমের অভাব ঘটে; হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।

অন্যান্য বিজয়

জজিরা

শাম ও এরাক বিজয়ের পর, হজরত ওমর ফারুক তাহার স্থায়ী শান্তি ও সুশাসনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিলেন। এছলামের বিধানুসারে জজিরতুল-আরবের শাসন-প্রণালী গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। পক্ষান্তরে রোম ও ঈরান সম্মিলিত শক্তি লইয়া, মোছলেম-শক্তি ধ্বংসের জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। তাহাদের সামন্ত বা অর্দ্ধ-স্বাধীন শক্তি সমূহ রোম ও ঈরানের সহিত যোগদান করিল। জজিরাবাসী হামছ পুনরধিকারের জন্য কায়ছরকে আহ্বান করিলেন। জজিরাবাসীর প্রস্তাবানুযায়ী কায়ছর এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিলেন। ত্রিশ সহস্র সৈন্য লইয়া জজিরাবাসী শাম যাত্রা করিলেন। আমির আবু-ওবায়দা তাহাদের অগ্রগতির প্রতিরোধ করিবার মানসে হামছ হইতে বহির্গত হইলেন। ফারুকে আ'জম অন্যান্য স্থান হইতেও বহু সৈন্য আবু-ওবায়দার সাহার্য্যার্থ প্রেরণ করিলেন। মোছলেম বাহিনীর প্রথম আক্রমণেই শত্রু সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু শত্রুগণ ইহাতে দমিত হইল না। তাহারা পুনরাক্রমণের আয়োজনে লিপ্ত হইল। ছা'দ জজিরাবাসীর উৎপাতের বিষয় খলিফাকে লিখিয়া পাঠাইলেন। খলিফা জজিরা আক্রমণের হুকুম পাঠাইলেন। ছা'দ, আয়াজ-বিন্ গনমের নেতৃত্বাধীন পঞ্চ সহস্র সৈন্যের এক বাহিনী জজিরা অধিকারে প্রেরণ করিলেন। আয়াজ রহা শহরে উপস্থিত হইলে, জজিরাবাসী জিজিয়া দানে স্বীকৃত হইয়া, এছলামের আশ্রয় লাভ করিল। (হিঃ ১৬ অব্দ।)

খোজেস্তান

মোদায়েন বিজয়ের পর মুগীরা বিন্ শো'বা বছরার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। খোজেস্তানের অধিবাসিবৃন্দ বছরায় অসহ্য উপদ্রব আরম্ভ করিলে, হিজরী ষোড়শ সালে তিনি হরমুজ শহরে সৈন্য চালনা করেন। তখন ইহার অধিবাসিগণ সন্ধি করিল। কিন্তু পর বৎসর কোন কারণে, মুগীরা পদচ্যুত হন। এই পরিবর্ত্তনে তাহারা আবার বিদ্রোহাচরণ করিল। আবু-মূছা আশ্‌আরী বিদ্রোহ সংবাদ দারুল-খেলাফতে প্রেরণ করিলেন। হজরত ফারুক খোজেস্তান অভিযানে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করিলেন। রাজধানী শোস্তর অধিকৃত হইল এবং শাসন কর্ত্তা হরমুজান ধৃত হইলেন। বন্দী হরমুজান আবু মূছার নিকট প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় যেন আমিরুল মোমেনীনের নিকট প্রেরণ করা হয়। আবু মূছা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। বহুমূল্য চাকচিক্যময় ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিচ্ছদসহ হরমুজান আমিরুল মোমেনীনের দরবারে উপস্থিত হইলেন। হরমুজান দেখিলেন, আমিরুল মোমেনীন মদিনার মছজেদে মাটীর উপর শুইয়া আছেন। এই দৃশ্য হরমুজান শোস্ত্রীকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। যাহাহউক হরমুজান এছলাম কবুল করিয়া, মদিনায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। হজরত ফারুক তাঁহার নিমিত্ত উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

হামদান ও নহাওন্দ প্রভৃতি

খোজেস্তান অধিকারের পর, ঈরানীগণ শক্তির শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দেড় লক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হইল। শহেন্‌শাহ্‌ এজদগের্দ্দ এরাক উদ্ধার পূর্ব্বক আরব আক্রমণের সঙ্কল্প লইয়া, হরমুজের পুত্র মরওয়ান

শাহ্‌কে নহাওন্দ প্রেরণ করিলেন। দারুল-খেলাফতে সংবাদ পঁহুছিল। ত্রিশ সহস্র মোছলেম সৈন্য না'মান বিন্‌ মক্‌রনের অধিনায়কত্বে পারস্য সম্রাটের বিরাট বাহিনীর মোকাবেলায় প্রেরিত হইল। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেনাপতি না'মান আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। হুজিফা বিন্‌ য়্যামান সেনাপতিত্ব গ্রহণপূর্ব্বক যথা নিয়মে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ত্রিশ হাজার ঈরাণী সৈন্য নিহত হইল। অবশেষে বিজয়-শশী হেলালের অঙ্কে আশ্রয় লইল। (হিঃ ২১ সাল)।

হুজিফা না'মানের শাহাদৎ ও বিজ সংবাদ মদিনায় প্রেররণ করিলেন। না'মানের শাহাদতের খবর পাইয়া, হজরত ওমর রোদন করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কে কে শহীদ হইয়াছেন? কাছেদ বলিল, আরও অনেক মোজাহেদ শহীদ হইয়াছেন। কিন্তু নাম ও সংখ্যা বলিতে পারিব না। হজরত ফারুক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"ওমর তাঁহাদের নাম জানিতে পারিল না সত্য; কিন্তু আল্লার দরবারে সেই শহীদানের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে।"

স্ফেহান

এরাকের সীমা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ঈরাণের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য হজরত ওমর ফারুক অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "যদি এরাক ও পারস্যের মধ্যে অগ্নি-পর্ব্বত হইত!" জজিরতুল-আরবের সুশাসন এবং বহির্দ্দেশে এছলামের সুসংবাদ প্রেরণের নিমিত্ত প্রতিবেশী শক্তিবর্গের সহিত সন্ধিস্থাপনে বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু প্রতিবেশী রোম ও ঈরাণ পরিবর্ত্তে অধিকতর উৎপাৎ আরম্ভ করিল। সুতরাং নহাওন্দ-বিজয়ের পর ছাহাবীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সমগ্র পারশ্যরাজ্য অধিকারের সংকল্প স্থির করিলেন।

আবদুল্লাহ বিন্ আবদিল্লাহ হিজরী একবিংশতি সালে, স্ফেহান আক্রমণ করিলেন। ঈরাণী সেনাপতি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

আজর-বায়জান

ইতিমধ্যে আজর-বায়জানবাসীগণ বিপুল সৈন্য সহ হামদান আক্রমণের কল্পনা করিতেছিল। ঈরাণী সেনাপতি এস্পিন্দিয়ার সসৈন্যে হামদান অভিমুখে যাত্রা করিলে, মোছলেম বাহিনী রুদ ময়দানে তাহাদের সম্মুখীন হইল। এস্পেন্দিয়ার পরাজিত হইলেন; জিজিয়া দানে সম্মত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আজর-বায়জানের অব্যবহিত পরে, মুকান, জিলান প্রভৃতিও অধিকৃত হইল। (হিঃ ২২ সাল।)

আরমেনিয়া, তিবরস্তান প্রভৃতি

আজর-বায়জান বিজয়ের সংবাদে জর্জ্জান, তিবরস্তান ও রোজবানের শাসনকর্ত্তাগণ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সুতরাং বিনাযুদ্ধেই এই সকল দেশ অধিকৃত হইল। আরমেনিয়ার শাসনকর্ত্তা জিজিয়ার পরিবর্ত্তে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দানে এছলামের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

পারশ্য

হিজরী সপ্তদশ সালে, খলিফার বিনা অনুমতিতে ওলাঃ বিন্ হজরমী খাছ পারছ বা পাঁরশ্য আক্রমণ করেন। হজরত ওমর খবর পাইয়া, নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। ওলার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন। যুদ্ধ জয় করিয়া, দেশত্যাগের উপদেশ পাঠাইলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ অতিরিক্ত দ্বাদশ সহস্র সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করিলেন। অবশেষে

নহাওন্দ বিজয়ের পর হজরত ওমর পারশ্য অধিকারে মনোনিবেশ করিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর হিজরী ২৩ সালে; আরজান, নওবিন্দজান, শিরাজ, ছাবুর, আস্তখর ও আর্দশির মোছ্‌লেম করতলগত হইল। ওছ্‌মান বিন্‌ আবি আ'ছ এই সকল যুদ্ধের প্রধান নায়ক ছিলেন।

কের্‌মান, ছিস্তান ও মক্‌রান

ছোহেল বিন্‌ আদী হিজরী ২৩ সালে, কেরমান-বিজয়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেরমানের 'মিরজবান' মোকাবেলা করিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রেই নিহত হইলেন। আছেম বিন্‌ ওমর কর্ত্তৃক এই বৎসর ছিস্তান এবং হাকম বিন্‌ আমর কর্ত্তৃক মক্‌রান অধিকৃত হয়।

খোরাছান

হজরত ওমর ফারুক সমগ্র পারশ্য-রাজ্যে 'হেলাল-খঞ্জরক্‌-লাঞ্ছিত বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে মনস্থ করিয়া, আহ্‌নফ বিন্‌ কায়ছকেই খোরছান বিজয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যপথে হিরাত অধিকার করিয়া, মোরবে-শাহজানের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই খানে সম্রাট এজ্‌দগের্দ অবস্থান করিতেছিলেন। বীর আহ্‌নফের আগমণ সংবাদ শ্রবণে, তিনি বলখ শহরে চলিয়া যান। আহ্‌নফ বলখ আক্রমণ করিলে, সম্রাট বলখ ছাড়িয়া খাকানের রাজ্যে আশ্রয় লইলেন।

মোছলেম বাহিনী ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া, সমগ্র খোরাছান প্রদেশ অধিকারে সমর্থ হইলেন। ইতিমধ্যে খাকান ও পারশ্য সম্রাট মিলিত হইয়া, বিরাট বাহিনী সহ পারশ্যরাজ্য পুনরধিকারে অভিযান করিলেন। বলখ শহরে প্রবেশ করিয়া, বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হইল। খাকান বলখে রহিলেন বটে, কিন্তু এজদগের্দ মোরবে-শাহজানের দিকে

অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে খাকানের অসংখ্য সৈন্য নিহত হইল। এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে বলখ ত্যাগ পূর্ব্বক অবশিষ্ট সৈন্য সহ খাকান স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

খাকান বাহিনীর পলায়ন-সংবাদে, এজদগের্দ হতাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতঃ পারশ্য হইতে চির বিদায় লইয়া রিক্ত হস্তে আবার খাকানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পারশ্যের অগ্নি-কুণ্ড চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল। এছলামের জ্যোতিতেপারশ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। (হিঃ ২৩ সাল।)

মিছর বিজয়

ফস্তাত

হিজরী ২০ সালে হজরত ওমর যখন শামের ছফরে গিয়াছিলেন, তখন হজরত আমর বিন্ আ'ছ মিছর অভিযানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হজরত ফারুক প্রথমতঃ অনুমতি দানে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। অবশেষে আমরের একাগ্রতা দেখিয়া অনুমতি প্রদান করেন। চারি সহস্র মোজাহেদীনের বাহিনী সহ বীরেন্দ্র আমর বিন্ আ'ছ মিছর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

আমরের বাহিনী ফরমা নামক স্থানে উপনীত হইলে, রোমক সৈন্যগণ তাহাদের অগ্রগতি রোধ করিয়া দাঁড়াইল। মাসেক কালের সংগ্রামের পর আমরের বাহিনী ফরমা ও বল্‌বিছ জয় করতঃ ফস্তাতে গিয়া উপস্থিত হইল। ফস্তাতে রোমকদিগের বিশাল সেনা-নিবাস ছিল। কায়ছরের দেওয়ান বা মকুকছ পূর্ব্বেই সেনা-নিবাসে পঁহুছিয়া যুদ্ধায়োজনে লিপ্ত হইয়াছেন। আমর রোমানদিগের আয়োজন সংবাদ অবগত হইলেন। অতিরিক্ত সৈন্যবল চাহিয়া খলিফাকে পত্র লিখিলেন। পত্র পাইয়া হজরত ফারুক জোবের বিন্ আওয়াম, এবাদা বিন্ ছামত, মেক্‌দাদ বিন্ ওমর এবং ছল্‌মা বিন্ মোখল্লদের অধিনায়কত্বে দশ সহস্র সৈন্য আমরের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। আমর জোবেরকে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। ক্রমাগত সাত মাসের আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ ও খণ্ড যুদ্ধের পর ফস্তাত অধিকৃত হইল। মকুকছ সন্ধি করিলেন।

স্কেন্দরিয়া

আমর ফস্তাত বিজয়ের সংবাদ খলিফাকে জ্ঞাপন করিয়া স্কেন্দরিয়া অভিযানের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। ফারুকে আ'জম আমরের আবেদন মঞ্জুর করিলেন। খলিফার অনুমতি পাইয়া আমর স্কেন্দরিয়া অভিযানে যাত্রা করিলেন। রোমান ও কবতীগণ মধ্যপথে গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। রোমক সেনাপতি স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমরে যোগদান করিবার আদেশ করিলেন। কিন্তু মকুকছের চুক্তির ফলে কবতী অধিবাসিগণ আন্তরিকতার সহিত রোমকদিগের জয় কামনা করিত না। বরং সম্ভব হইলে মোছলমানদিগেরই সাহায্য করিত। মোছলেম বাহিনী অল্লায়াসে এই বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক স্কেন্দরিয়া অবরোধে সমর্থ হইল। স্কেন্দরিয়া দুর্গ অনেক দিন অবরুদ্ধ হইয়া রহিল। বিজয়ে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া হজরত ফারুক আমরকে এক পত্র লিখিলেন, —"**বোধ হয়, তোমরা সেখানে থাকিয়া খৃষ্টান-দিগের ন্যায় বিলাসী হইয়া পড়িয়াছ। অন্যথায় বিজয়ে এত বিলম্ব ঘটিত না। সৈন্যদিগকে সমবেত করিয়া জেহাদের ওয়াজ কর।**" আমর সৈন্যদিগকে সমবেত করিলেন। খলিফার ফরমান পাঠ করিয়া শুনাইলেন। খলিফার উৎসাহবাণী পাইয়া তাহারা নববল লাভ করিল। এমন ভীষণ বেগে রোমকদিগকে আক্রমণ করিল যে, প্রথম আক্রমণেই রোমক বাহিনী পরাস্ত হইয়া গেল এবং স্কেন্দরিয়া জয় হইল। আমর "ফৎহে নামা" সহ মআবিয়া বিন্ খরিজকে মদিনায় প্রেরণ করিলেন। দ্বিপ্রহর সময়ে মআবিয়া মদিনায় পঁহুছিলেন। আমিরুল মোমে-

নীনকে আগমন-সংবাদ না জানাইয়া তিনি মছজেদে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু হজরত ওমর অন্য সূত্রে মছজেদে কাছেদের আগমন সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। "ফৎহের" খবর শুনিয়াই আল্লার দরবারে শোকরের ছজিদা করিয়া মছজেদে উপস্থিত হইলেন। মআবিয়া সমবেত মোছলমানদিগকে স্কেন্দরিয়া বিজয়ের বিবরণ জানাইলেন। অবশেষে হজরত ওমর ফারুক মআবিয়াকে বলিলেন,—তুমি আসিবা মাত্র আমাকে সংবাদ জানাইলে না কেন? মআবিয়া সবিনয়ে নিবেদন জ্ঞাপন করিলেন, হুজুরের আরামে ব্যাঘাত জন্মিবে মনে করিয়া। উত্তরে ফারুক বলিলেন—"**আমার সম্বন্ধে এই কি তোমাদের ধারণা? আমি যদি দিবানিদ্রায় আসক্ত হইয়া পড়ি, খেলাফতের দায়িত্ব সম্পন্ন করিবে কে?**"

যুদ্ধবন্দী

স্কেন্দারিয়ায় বহু খৃষ্টান বন্দী হইয়াছিল। হজরত আমর যুদ্ধ বন্দীর সংখ্যাধিক্যের উল্লেখ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে কি করা উচিত, খলিফার নিকট তাহা জানিতে চাহিলেন। উত্তরে খলিফা হজরত ওমর লিখিয়া পাঠাইলেন, —"তাহাদিগকে মুক্তি দাও। তাহাদিগকে বলিয়া দাও,—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এছলামে আত্মসমর্পণ করিলে, তাহারা মোছলমানের অধিকার পাইবে। যাহারা তাহাদের পূর্ব্ব ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে, তাহারা জিম্মী-প্রজার অধিকার পাইবে।" আমর সেই সহস্রাধিক বন্দীকে সমবেত করিয়া খলিফার ফরমান পড়িয়া শুনাইলেন। বহু বন্দী বিজয়ীর এই উদার ঘোষণাবাণী শুনিয়া এবং বিজয়ীর ধর্ম্মের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যের বিষয় অবগত হইয়া এছলাম কবুল করিল। অবশিষ্ট বন্দী আপন আপন

ধর্ম্মত্যাগে সম্মত হইল না। অনেক বীরবাহু মোজাহেদী অন্ধ বিশ্বাসের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ দেখিয়া ও তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বিজয়ী বীরের ক্রন্দন শ্রবণে সেই অবশিষ্ট বন্দীর মধ্যে অনেকে আবার এছলাম গ্রহণ করিল। *

* শাম, এরাক ও মিছর বিজয়ের এই অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রধানতঃ আল্লামা শিবলীর "আল্‌ফারুক" (الفاروق) অবলম্বনে লিখিত। আল্লাহ্ তাআলা তওফিক দিলে, ফারুকের বিজয় ইতিহাসের সহিত এছলামের জেহাদ নীতি এবং ফারুকের জেহাদ ও দেশ এবং ধর্ম্মের পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রভৃতির আলোচনা করিব। "ফারুক চরিতে" ফারুকে আজমের বিজিত রাজ্যের ভৌগলিক বিবরণ দেওয়া হইল না। সর্ব্বত্র প্রাচীন নামই ব্যবহার করিয়াছি। বিজয়-ইতিহাসে প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্নতা দেখাইয়া ভৌগলিক বিবরণ দিব, ইন্‌শা আল্লাহ্‌।

শাহাদৎ

"ফারুক-জীবনের" এমন বহু বিষয় এখনও লিখিবার বাকী আছে, জীবনেতিহাসের সেই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করার পর শাহাদতের শোক প্রকাশ করিলে, নিয়ম প্রতিপালিত হইত। কিন্তু অন্য এক সম্বন্ধ বজায় রাখিবার নিমিত্ত আমি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলাম। যাঁহার অঙ্গুলি হেলনে সহস্র সহস্র বীর গাজী অকাতরে আপন বুকের রক্ত দিয়া শাম এরাক ও মিছরের সমতল ভূমি বিধৌত করিয়াছিলেন; যাঁহার ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র আরব মোজাহেদ দিজ্‌লা, ফোরাৎ ও নীল নদের অনীল নীরে রক্তিম আভা দান করিয়াছিলেন, সেই বীরবৃন্দের উপর মহামান্য নেতা ফারুকে আ'জমের ইচ্ছা শক্তি কতদূর বলবতী ছিল এবং কোর্‌আন মজিদের নির্দ্দিষ্ট শাহাদৎকে তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার যৎসামান্য আভাস দিবার জন্য কাদেছিয়া, য়্যার্‌মুক ও স্কেন্দারিয়ার শহীদানের স্মৃতির অব্যবহিত পরে হজরত ওমর ফারুকের শাহদতের বিবরণ সংযোজিত করিলাম। খালেকুল খল্ক্ ও মুজিবুদ্দাওয়াত আল্লাহ্ তাআলার মহান দরবারে সর্ব্বান্তঃকরণে সকাতর প্রার্থনা করি, ফারুকে আ'জমের সেই পবিত্র ইচ্ছা শক্তির সত্য প্রভাব "ফারুক-চরিতের" প্রত্যেক সাধু পাঠকের হৃদয়ে প্রতিফলিত হউক!

"শহীদ" ও "শাহাদতের" অনুবাদ বা প্রতিশব্দ দেওয়া একেবারে অসম্ভব। এছলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মের পরিভাষায় ইহার প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। গীতার "ধর্ম্ম যুদ্ধে মৃত বাপি" ও "ধর্ম্ম যুদ্ধে মৃত্যু" "শহীদ" ও "শাহাদতের" প্রতিশব্দ নহে। ইংরেজী martyer বা

martyerdom আদৌ ইহার অর্থবাচক নহে। এই কারণে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের পরিভাষায় শহীদ ও শাহাদতের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। এছলাম শহীদের কফন-দফন সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দান করিয়াছে। পরলোকে শহীদের অনন্ত সুখ সম্বন্ধে কোরআন মজিদ ও হাদীছ শরীফে অনেক কথা আছে। আমি মাত্র কোর্‌আন মজিদের পরিভাষায় "শহীদের" পরিচয় দিয়া হজরত ওমর ফারুকের শাহাদতের বিবরণ দিব। কোর্‌আন মজিদ বলিতেছে,—

لاتقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات ط بل احياء ولكن لا تشعرون - (بقره)

"যাহারা আল্লার পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত বলিও না, বরং তাহারা চিরঞ্জীব অথচ তোমরা বুঝিতেছ না।"

নিয়তির বিধানে মৃত্যুর কঠোর করস্পর্শ অনিবার্য্য। মৃত্যু অতি ভীষণ ও বিভীষিকাময়। সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে মানুষ মৃত্যু-বিভীষিকার করাল কবল হইতে আত্মরক্ষার উপায় অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছে। গীতা সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য "ধর্ম্ম যোদ্ধাদিগকে" "ধর্ম্ম-যুদ্ধে মৃত বাপি তেন লোকত্রয়ং প্রিয়ঃ" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। "ত্রিজগৎ-প্রিয়তা" মানুষের পক্ষে প্রিয় ও কাম্য।" পৃথিবীতে আরও বহু কার্য্য আছে, যদ্দ্বারা মানুষ "ত্রিজগৎ-প্রিয়" হইতে পারে। কিন্তু সে জগৎ-প্রিয়তা হইতে কিছু অধিক চাহে। মানুষ মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহে। লোক-প্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিত্রাণের সন্ধান কেবল কোর্‌আন মজিদই দিয়াছে। কোরআনে হাকিম ধর্ম্মযুদ্ধের দৃশ্যতঃ মৃত্যুর মধ্যে অনন্ত জীবনের সন্ধান দিয়াছে। মৃত্যুর বিভীষিকাময় কবল হইতে মানুষের আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছে, অতীতেন্দ্রিয়

মৃত্যু বা জেহাদের শাহাদতে। অতীতেন্দ্রিয় মৃত্যু সম্বন্ধে কোরআনের এই উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। রোগ ও অনাহার-ক্লেশের তিলক্রমিক মৃত্যুর সহিত তুলনা করিয়া কোন জড়বাদীও এই সত্য অস্বীকার করিতে পারিবে না। জাতীয় জীবনের ইতিহাসে কোর্‌আনের উক্তি সুস্পষ্ট হইয়া আছে। সেদিন গ্রীক বর্ব্বর কর্ত্তৃক স্মার্ণার মোছলেম অধিবাসিবৃন্দের শাহাদতের মধ্য দিয়া সমগ্র এশিয়া মাইনরের মুক্ত জীবন লাভ হইয়াছে। এছ্‌লামের প্রাথমিক ইতিহাসে ইহা আরও স্পষ্টতর হইয়া আছে। ওহদের শাহদতের মারফতে মক্কা বিজয় এবং মক্কা বিজয়ের ভিতর দিয়া কিরূপে সমগ্র আরবের এমনকি সমগ্র পৃথিবীর জীবন লাভ হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক ইতিহাস-পাঠকই অবগত আছেন।

কোর্‌আন মজিদ আল্লাহ তাআলার কালাম। প্রাথমিক যুগের মোছলেমগণ আল্লার কালাম কোর্‌আনের প্রতি বিপুল বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁহারা কোর্‌আনের নির্দ্দিষ্ট শাহাদৎকে যথাযথরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা শাহাদৎকে "শাহাদ" বা অমৃত জ্ঞানে পান করিতেন। তাই মহামতি ফারুক আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করিতেন,

اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك

হে আল্লাহ! তোমার পথে—সত্যের পথে আমাকে শাহাদৎ দান করিও।" মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তিনি এমনই ভাবে আল্লার পথে শাহাদতের অনন্ত জীবন কামনা করিতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন—তাঁহার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। তাই আবু-ওবায়দ,

আবু-জায়দ ও মোছন্নার সহগামী না হইয়াও তিনি শাহাদৎ হাছেল করিয়াছিলেন।

মদিনার মছ্জেদে নিয়ম ছিল, মোছলমানগণ নমাজ সমাপনার্থ সারিবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইলে পর, হজরত ওমর ফারুক আসিয়া এমামের কার্য্য সম্পাদন করিতেন। একদা প্রাতঃকালে ফজরের নমাজ সমাপনার্থ ভক্তি-গদ্‌গদ মোছল্লীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান এবং হজরত ফারুক এমামের নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হইয়া মাত্র নমাজ আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে পাপিষ্ঠ ফিরোজ তাঁহাকে গুপ্ত ছোরার দ্বারা উপর্য্যুপরি ছয়টি আঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ তিনি হজরত আবদুর রহমান বিন্ আউফকে হাত ধরিয়া এমামৎ করিবার আদেশ দিলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সেই সাংঘাতিক আঘাতের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইয়া পড়িলেন।

অতঃপর হজরত ওমর ফারুক গৃহে আনীত হইলেন। গৃহে আনীত হইলে, তিনি গুপ্ত ঘাতকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে নরাধম ফিরোজ পারশিকের নাম বলা হইল। উত্তর শুনিয়া হজরত ফারুক বলিলেন,—"আল্‌হামদু লিল্লাহ্, আমার ঘাতক কোন মোছলমান নহে—মোছলমান কর্ত্তৃক আমি আহত হই নাই।"

অনন্তর চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কিন্তু নাভীর নিম্নভাগের আঘাত বড়ই গুরুতর ছিল। চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে যে দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন, তাহা এই আঘাতের ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইয়া গেল।

পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে ডাকিয়া হজরত ওমর বলিলেন, "হজরত আয়শার নিকট যাও, রছুলুল্লার পার্শ্বদেশে আমাকে দফন করিবার অনুমতি প্রার্থনা কর।" আবদুল্লাহ্ অবিলম্বে হজরত আয়েশার নিকট এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। "উহা আমি নিজের জন্যই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম; কিন্তু

আমার চেয়ে ওমরের দাবী অগ্রগণ্য।" বলিয়া হজরত আয়েশা আবদুল্লার মারফতে অনুমতি দিলেন।

ছাহাবীগণ হজরত ওমর ফারুককে, ভাবী খলিফা মনোয়নের নিবেদন জ্ঞাপন করিলেন। সুস্থাবস্থায় তিনি বরাবর ভাবী খলিফা সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন। এমনকি অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, তিনি একাকী চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলিতেন,—"আমি ভাবী খলিফা সম্বন্ধে ভাবনা করিতেছি।" এই মহা প্রায়াণ-কালে ছাহাবীদিগের প্রশ্নের উত্তরে, তিনি নিঃসঙ্কোচে বলিয়া উঠিলেন,—"আহ! এই গুরু দায়িত্ব ভার বহনের লোক আমার নজরে পড়িতেছে না।" এই বলিয়া তিনি হজরত আলী, হজরত ওছমান, হজরত জোবের, হজরত তল্‌হা, হজরত ছা'দ বিন্‌ আবি অকাছ ও হজরত আবদুর রহমান বিন্‌ আউফ এই ছয় জনের নাম করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হজরত আলী হায়দরকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম মনে করিতেন। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া তিনি তাহা বলিয়া যান নাই। বরং তিনি বলিলেন,—"মতাধিক্যের দ্বারা এই ছয় জনের মধ্য হইতেই খলিফা নির্ব্বাচিত হইবেন।" ভাবী খলিফাকে উদ্দেশ করিয়া বহু আবশ্যকীয় বিষয়ে অছিয়ৎ করিলেন। (১)

তারপর পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে তাঁহার ঋণশোধন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বলিলেন,—"আমার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে যদি আমার ঋণ পরিশোধ হয়ত ভালই। যদি তাহাতে পরিশোধ না হয়, তবে প্রথমতঃ আদী এবং তারপর কোরেশ বংশের নিকট চাঁদা করিয়া আমার কর্জ্জ আদায় করিবে। অন্য কোন বংশকে উত্যক্ত করিও না।"

হজরত ওমর ২৬শে জিল্‌হজ শুক্রবার

(১) জিম্মী-প্রজার অধিকার প্রসঙ্গে ইহা উদ্ধৃত হইবে।

প্রত্যুষে গুপ্ত ঘাতক কর্ত্তৃক আহত হন। পরবর্ত্তী রবিবার দিবস ১লা মোহররম্ তিনি এন্তেকাল করেন এবং উক্ত দিবসেই তাঁহার দফন-কার্য্য সম্পন্ন হয়। হজরত ছোহেব জানাজার নামাজ পড়াইয়াছিলেন। হজরত আলী, হজরত ওছমান, হজরত আবদুর রহমান বিন্ আউফ প্রভৃতি তাঁহাকে কবরে স্থাপন করেন। দেখিতে দেখিতে বিশ্বের সেই গৌরব-রবি বিশ্ববরেণ্য পুরুষ খলিফা হজরত ওমর ফারুক মৃত্তিকা গর্ভে লুক্কায়িত হইলেন। "আফ্তাবে আ'লম তাব" সমগ্র পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করিয়া অবশেষে স্বয়ং আকা মোস্তফার পার্শ্বদেশে মদিনার "খাকে পাকে" আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভাস্কর মদিনার মৃত্তিকায় লুক্কায়িত হইলেন বটে, কিন্তু ভাস্কর-কিরণে আজ পর্য্যন্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে।

আদর্শ বিজয়ী

হজরত ওমর ফারুকের বিজয়ের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বিজিত রাজ্যের বিস্তৃতি দেখাইয়া আসিয়াছি। এক বিজয়ীর স্মৃতির সহিত অপরাপর বিজয়ীর স্মৃতির তুলনা করা, মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক কৌতুহল। বিশ্ব-সাহিত্য ও বিশ্ব-ইতিহাসের প্রধান অধ্যায়, বোধ হয়, দিগ্বিজয়ীরই স্মৃতি। আজও বিশ্ব-মানব যে অতুল আনন্দ ও বিপুল বিস্ময় এই স্মৃতি আলোচনায় উপভোগ করে, অন্যত্র তাহার তুলনা নাই। তাই আমরা দেখি, ছক্রাত ও আরস্তাতিল অপেক্ষা ছেকান্দরকেই অধিক লোকে জানে এবং জানিতে চাহে। সুতরাং বিভিন্ন বিশ্ববিশ্রুত দিগ্বিজয়ীর সহিত মহামান্য ফারুকের তুলনার কৌতুহলও পাঠকের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক।

হজরত ওমরের পূর্ব্বে এবং পরে যে সকল বীর দেশ বিজয় ও রাজ্য বিস্তারের দ্বারা জগতে স্বনামখ্যাত হইয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ছেকান্দারই যেন সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। অন্ততঃ কাব্য সাহিত্য তাঁহাকে অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী করিয়া রাখিয়াছে। ছেকান্দর মক্দুন হইতে পারশ্য দেশ জয় করিয়া ভারতবর্ষেও রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু সেই বিজয়ও বিস্তারের ইতিহাসে তাঁহার গৌরব অপেক্ষা কলঙ্কেরই পরিমাণ অধিক। তাঁহার রাজ্য-বিস্তার ও রাজ্যাধিকার অর্থহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন। সত্য বটে; দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় পার হইয়া তিনি রাজা পুরুর সহিত কতঞ্চিৎ বীরোচিত সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কারণ স্বতন্ত্র। অন্যত্র এই আদর্শ প্রতিপালিত হয় নাই। ঈরাণের তদানীন্তন রাজধানী আস্তথর নগর অধিকারের পর ছেকান্দর যে অকথ্য অত্যাচারের অনুষ্ঠান

করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। বিজিত আস্তথরবাসীর মধ্য হইতে আবালবৃদ্ধ পুরুষগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া অতি নির্ম্মভাবে নিহত করিয়াছিলেন। এইরূপে আস্তথর নগর পুরুষ শূন্য করিয়াছিলেন। শাম বা সিরিয়া দেশের ছুর শহর অধিকারের পর তিনি যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আরও মর্ম্মন্তুদ। ছুরে বীর শামবাসী অতি দৃঢ়ভাবে ছেকান্দর বাহিনীর প্রতিরোধ করিয়াছিল। দীর্ঘ প্রতিরোধে তাঁহার বহু সৈন্যের প্রাণনাশ ঘটিয়াছিল। অবশেষে শামবাসী আত্মসমর্পণ করিলে তিনি সেই পতিত নিরস্ত্র শত্রুর অবাধ হত্যার আদেশ করিলেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকামী বা স্বাধীনতাপ্রিয় একজন লোককেও তিনি জীবিত রাখেন নাই। সহস্র সহস্র নরমুণ্ড নগর প্রাচীরে লট্‌কাইয়া দিয়া অবীরোচিত তামাশা দেখিতে ছেকান্দার শাহ একটুও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বিশ সহস্র শামবাসীকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া মনুষ্যত্বের নামে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছেন। **পক্ষান্তরে ফারুকের রাজ্যবিস্তারে অবাধ হত্যার কথা দূরে থাকুক, বিজিত রাজ্যের বৃক্ষচ্ছেদন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। খলিফা হজরত ওমর সেনাপতির নামে ফরমান পাঠাইতেন,**

فان قاتلو كم فلا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً

"শত্রুর সহিত ধূর্ত্ততা করিও না, তাহাদের কর্ণ বা নাসিকা ছেদন করিও না এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ও শিশু হত্যা করিও না।" (১)

(১) খোদার ফজলে, এই সকল ফরমান ফারুকে আ'জমের বিজয় ইতিহাসে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইবে।

পরিমাণ-ফলে হিসাবেও ছেকান্দরের রাজ্যাপেক্ষা ফারুকে আ'জমের বিস্তৃত রাজ্য বৃহত্তর। মহাবীর ছেকান্দর এশিয়া ও আফ্রিকায় যে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা একে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল, তার উপর ক্ষণস্থায়ী সামরিক শাসন ব্যতীত তাহার শাসন সৌকর্য্যের কোন ব্যবস্থা তিনি করেন নাই। তাঁহার ত্যাগের পর বিজিত রাজ্যে স্বতন্ত্র বা সামন্ত রাজার উদ্ভব হইয়াছে। পক্ষান্তরে হজরত ওমর ফারুকের বিজিত রাজ্যের পল্লী প্রান্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ব্যাপক ভাবে ন্যায় ও সমদর্শী শাসন প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার সমস্ত বিজিত রাজ্য পরস্পর সহানুভূতির অভেদ্য ও অবিচ্ছেদ্য রজ্জুতে আবদ্ধ। চেঙ্গিজ, তৈমুরের সহিত হজরত ওমরের রাজ্য বিস্তারের তুলনা হইতে পারে না। কারণ অত্যাচারের কথা ছাড়িয়া দিলেও রাজ্য বিস্তার তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। ইউরোপীয় খৃষ্টান শক্তি-বর্গের রাজ্য বিস্তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইলেও, সামরিক শক্তিবলে তাহারা কোন উল্লেখযোগ্য রাজ্য বিস্তার করেন নাই, ইহা অতি কঠোর সত্য। হজরত ফারুকের নিষিদ্ধ ধূর্ত্ততাকেই যেন তাঁহারা নীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পলাশী হইতে কাহেরা এবং কাহেরা হইতে দেমস্ক পর্য্যন্ত ডুপ্লে, ক্লাইভ প্রভৃতি কর্ত্তৃক এই নীতি কি ভাবে অনুসৃত হইয়াছে, অভিজ্ঞ পাঠককে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

ফারুকের মহত্ব এবং বিশেষত্ব শুধু এই খানে নহে। ফারুকের যথার্থ বিশেষত্ব তাঁহার অসাধারণ ত্যাগে এবং অপূর্ব্ব নেতৃশক্তিতে ছোকরন্দ। চেঙ্গিজ প্রমুখ বিজয়ী বীরগণ ভোগের লোভ দেখাইয়া, সৈন্যদল গঠন করিয়াছেন। দলপতি পিছনে পিছনে চলিয়া তাহাদিগকে উস্কাইয়া ও উত্তেজিত করিয়া পররাজ্য ও পরধন লুণ্ঠনে উৎসাহিত করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু ফারুকে আ'জম সৈন্যদল গঠন করিয়াছেন, ত্যাগ ও সংযম শিক্ষার দ্বারা। ফারুকের সৈন্যদল যুদ্ধ করিয়াছে, আত্মরক্ষা ও সত্যের প্রতিষ্ঠার

জন্য। ফারুক রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, অধিবাসীর মুক্তি ও সুখ শান্তির জন্য। তাই উত্তরাধিকারিগণের শত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও, ফারুকের বিজিত রাজ্যে তের শত বৎসরের উর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত তাঁহারই প্রবর্ত্তিত শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ত্যাগের কঠোর শাসন সত্ত্বেও ফারুকের প্রতি মোজাহেদীনের ভক্তি বিশ্বাস ও আনুগত্যের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। মদিনায় বসিয়া সুদূর পারছ, কাদেছিয়া, য়্যারমুক ও স্কেন্দরিয়া বাহিনীকে তিনি যে শৃঙ্খলার সহিত পরিচালন করিয়াছেন, এমন কি তাহাদের ব্যূহ রচনায় সহায়তা করিয়াছেন, তাহা একমাত্র মহাবিজয়ী ফারুক ভিন্ন বিশ্বের অন্য কোন বীরের কার্য্যে তাহা পাওয়া যাইবে না।

হিজরী সপ্তদশ সালে মহাবীর ওলা খলিফার বিনা অনুমতিতে পারস্য আক্রমণ করিয়া জয়ের পর বিজিত রাজ্য কিরূপ ভাবে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। সুদূরে অবস্থিত নেতার আদেশে মাত্র সৈন্যদল কর্তৃক এমনই ভাবে বিজিত রাজ্য ত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় ইহাই একমাত্র। জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজিত রাজ্যের এরূপ সুশাসনের ব্যবস্থাও অন্য কোন বিজয়ীর দ্বারা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

সেনাপতি ও সৈন্যদলের প্রতি কঠোর শাসনের প্রমাণ পুস্তকের নানা স্থানে পাইবেন। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি করিব। হজরত খালেদ বিন্ অলীদের বীরত্ব ও রণ-কৌশল বিশ্ব বিশ্রুত। অসাধারণ বীরত্বের জন্য মোছলেম জগতে তিনি "ছায়ফুল্লাহ্ বা আল্লার অসি" নামে খ্যাত। সেই মহাবীর ছয়ফুল্লাহ্‌কে তিনি যে কারণে পদাবনত ও পদচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহাতে এক দিকে যেমন খালেদের আনুগত্যের পরিচয়, অন্যদিকে তেমনই ফারুকে আ'জমের অসাধারণ নেতৃশক্তির নমুনা পাওয়া যাইবে। হজরত ওমর খেলাফতের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়া,

হজরত খালেদকে বিশেষ তাকিদ করেন, গণিমতের যথাযথ হিসাব যেন যথারীতি দারুল-খেলাফতে প্রেরিত হয়। খালেদ বীর যোদ্ধা, হিসাবের কার্য্য তাঁহার পছন্দ হইল না। তাই খলিফা তাঁহাকে হজরত আবু ওবায়দার পরিচালনাধীন করিয়া দেন।

অতঃপর একদা হজরত খালেদ কোন কবিকে দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেন। সংবাদ সংগ্রাহকগণ এই কথা খলিফাকে জানাইলেন। খলিফা ফরমান পাঠাইয়া হজরত খালেদকে জানাইলেন, যদি তিনি নিজের সঞ্চিত অর্থ হইতে কবিকে এরূপ পুরস্কার দান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা অপব্যয় বা এছরাফ। আর যদি বায়তুল-মালের অর্থ হইতে কবিকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন তাহা হইলে উহা তাঁহার পক্ষে বিশ্বাস ঘাতকতা বা খেয়ানৎ। উভয় অবস্থাতেই তাঁহার যথোচিত শাস্তির বিধান হওয়া আবশ্যক। কাছেদকে উপদেশ দিলেন, যদি বায়তুল মাল হইতে তিনি ঐ পুরস্কার দিয়া থাকেন তাঁহার পদচ্যুতির আদেশ শুনাইবে ফরমান লইয়া কাছেদ খালেদের নিকট উপস্থিত হইল। কাছেদ হজরত খালেদকে সমবেত মোছলেমদিগের সম্মুখে জিজ্ঞাসা করিল, পুরস্কারের অর্থ তাঁহার নিজস্ব কি না? খালেদ লজ্জায় কোন উত্তর দিলেন না। অগত্যা কাছেদ তখন পদচ্যুতির নিদর্শন স্বরূপ সেই বিশাল জন-সঙ্ঘের সম্মুখে, তাঁহার মাথার টুপি নামাইয়া লইয়া, তাঁহারই আমামাকে রজ্জু করিয়া তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিল। আর মহাবীর খালেদ দৃষ্টি তুলিয়া একবার সেই দৃশ্য দেখিলেন না। রুস্তবীর একবার নিজের গর্দ্দন হেলাইতে পারিলেন না। বাধ্যতার এমন সুন্দর ও অনুপম দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে কেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন কি?

কিয়দ্দিন পরে হজরত খালেদ তাঁহার পদচ্যুতি সম্বন্ধে হাঁমছে এক

বক্তৃতা করেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমীরুল মোমেনীন আমাকে সেনাপতি করিয়া শামদেশ বিজয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জয়ের পর বিজয়ীকে পদচ্যুত করিলেন। খালেদের মুখে এই কথা শ্রবণ মাত্রই, জনৈক সৈনিক শ্রোতা দাঁড়াইয়া ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "সাবধান! এরূপ আপত্তিজনক কথা বলিও না। ইহাতে ফেৎনা বিবাদের সৃষ্টি হইতে পারে।" শাসনের এমন কঠোর ব্যবস্থা ছেকান্দর বা চেঙ্গিজের কার্য্যে কোথায়?

অবশেষে হজরত ছয়ফুল্লাহ্ খালেদ বিন্ অলিদ মদিনা মোনওয়ারায় আসিয়া প্রমাণ করেন যে, সেই পুরস্কারের অর্থ তাঁহার, বায়তুল মালের নহে। খলিফা তৎক্ষণাৎ ফরমানের দ্বারা রাজ্যের সর্ব্বত্র এই কথা ঘোষণা করিয়া দিলেন।

শাসন-প্রণালী

হজরত আবুবকর ছিদ্দিকের খেলাফৎ-কাল পর্য্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে হজরত ওমর ফারুকই প্রথম মোছলেম-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই বিশাল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি দেখাইয়া আসিয়াছি। এই সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসনে ফারুকে আ'জম যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার আলোচনা করিব।

খলিফা হজরত ওমর আপনার তথা এছ্‌লামের শাসননীতি-সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—"আমি রাজা নহি যে, তোমাদিগকে ভারবাহী দাস করিব। আমি আল্লার দাস, তোমাদের সেবক। খেলাফতের দায়িত্ব-ভার আমার স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। এখন আমি যদি তোমাদের সেবা করিতে পারি, আর আমার সেবার ফলে যদি তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে শয়ন করিতে পার, তাহা হইলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করিব। আর যদি আমার এরূপ কামনা হয় যে, তোমরা আমার দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমার স্তুতিবাদ কর, তখন আমি নিজের দুর্ভাগ্য জ্ঞান করিব। আমি

তোমাদিগকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কার্য্যের দ্বারা—বাক্যের দ্বারা নহে।”

প্রকৃতিপুঞ্জের অধিকার-হিসাবে শাসন-প্রণালী দুই প্রকার; গণতন্ত্র ও স্বেচ্ছাতন্ত্র। অবশ্য ইহার প্রত্যেকের আবার প্রকার-ভেদ আছে। আমরা হজরত ওমরের শাসন-নীতি পাঠকবৃন্দের গোচরীভূত করিব। দুনিয়ার অতীত ও বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী সমূহের সহিত তুলনা করিয়া ইহা কোন্ শ্রেণীর শাসন তাহা পাঠকগণই বিচার করিয়া স্থির করিবেন।

শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের সমালোচনা করিবার অধিকার যদি প্রজার না থাকে, শাসন-ব্যাপারে তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে যদি না পারে; উপরন্তু শাসন-কর্ত্তা বা শাসক-সম্প্রদায় সর্ব্বেসর্ব্বা হন, তাহা হইলে সেই শাসন-প্রণালীকে স্বেচ্ছাতন্ত্র বলা হয়। স্বেচ্ছাতন্ত্রের সাক্ষাৎ-ফল এই যে, জ্ঞান বুদ্ধি এবং যোগ্যতা ব্যর্থ ও বেকার হইয়া যায়। ক্রমে দেশে শাসন-শক্তির লোপ ঘটে। বিভিন্ন দল বা সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগের উচিত প্রতীকার হইতে পারে না। স্বার্থপরতার প্রাদুর্ভাব হয়; পরার্থপরতা ও জাতীয় ভাব সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বেচ্ছাচারমূলক অধীনতায় বহু দিন অবস্থান করিতে থাকিলে, প্রকৃতিপুঞ্জ জীবন্মৃত অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে গণতন্ত্র-শাসনে এই সকল অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। দেশ উন্নত ও সম্পদশালী হয়।

হজরত ওমর যখন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক বিশাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, তখন জগতের সর্ব্বত্রই স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন প্রচলিত ছিল। যে সকল দেশ এছলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে পারশ্য চিরকাল স্বেচ্ছাচার পদ্ধতিতে শাসিত হইত। অবশ্য রোমানদিগের মধ্যে Democracy বা গণতন্ত্রের আদর ছিল। কিন্তু সেই “ডিমক্রেসি” আরব

ও ভারতের নিকট অপরিচিত ছিল না। আমরা গ্রীক্ ইতিহাস ও ইংরেজী সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে "ডিমক্রেসির" সংবাদ পাই, তাহা কোন অপার্থিব শাসন-প্রণালী নহে। বাস্তবিক পক্ষে উহা আরব ও ভারতের সামাজিক শাসন বা পঞ্চায়ৎ প্রথা। প্রভেদ মাত্র এই যে, রাজ্যশাসনে ইহার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া এই পদ্ধতিতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিবার চেষ্টা হইতেছিল মাত্র। এই প্রথা ভারত-বর্ষের পল্লী-প্রান্তরে এখনও বিদ্যমান আছে। হজরত ওমরের বহু পূর্ব্বে রোমানগণ সেই গৌরব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। হজরত ওমরের সময়ে রোমানদের দেশে ভীষণ অত্যাচারমূলক স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রচলিত ছিল। সুতরাং আল্লাহ তাআলার বাণী ও রছুলের উপদেশ ব্যতীত অন্য কোন পথপ্রদর্শক তাঁহার ছিল না। অন্য কোন আদর্শও তিনি দেখেন নাই, যাহার অনুকরণে বা অনুসরণে তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন।

হজরত ওমর ফারুক দেখিয়াছেন, আল্লার রছুল যে সকল বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ পাইতেন না, তাহা সমবেত পরামর্শ দ্বারাই সম্পন্ন করিতেন। হজরত ওমর খলিফা পদে বৃত হইয়া সকল বিষয়ে এবং সকল সময়ে সমবেত পরামর্শ দ্বারাই শাসন কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এই পরামর্শ গ্রহণ প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি খলিফার "অনুগ্রহ" নহে। বরং এই পরাপর্শ গ্রহণে খলিফা বাধ্য। এই পরামর্শ সম্বন্ধে স্বয়ং হজরত ওমর বলিতেন,

"خلافة لا عن مشورة"

"সমবেত পরামর্শ ব্যতীত খেলাফৎ হইতে পারে না।" (১)

---

(১) كنز العمال

খেলাফতের দৈনন্দিন কার্য্য-সম্পাদনের জন্য এক কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা ছিল। হজরত ওছ্মান, হজরত আলী, হজরত আবদুর রহমান বিন্ আউফ, হজরত মআজ বিন্ জবল, হজরত উবাই বিন্ কা'ব, এবং জায়দ বিন্ ছাবেত এই সভার সদস্য ছিলেন। [১] এই কার্য্য নির্ব্বাহক সভার পরামর্শের জন্য যে সভা, তাহার নাম মজলিছে শূরা مجلس شورى ছিল। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে এই সভার বিচার শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইত। কিন্তু অধিকতর গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার জন্য সাধারণ সভার অধিবেশন হইত। এই দুই সভার ক্ষমতা ও অধিকার নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। শাম ও এরাক-বিজয়ের পর উহার শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বৃহত্তর সভা আহুত হয়। প্রত্যেক কবিলার এক এক জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। "আমার উপর তোমরা যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছ, তাহাতে অংশ গ্রহণের জন্যই আমি তোমাদিগকে সমবেত করিয়াছি" [২] বলিয়া হজরত ফারুক এই সভার উদ্বোধন করেন। জনসাধারণ নির্ভীক ও স্বাধীন ভাবে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করেন। নহাওন্দ যুদ্ধের সময়ে হজরত ফারুক স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও এক সাধারণ-সভা আহুত হয়। সেই সভায় হজরত আলী খলিফার পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া সমীচীন নহে বলিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, অধিকাংশের দ্বারা তাহা গৃহীত হয়, এই সকল বিষয়ের পরিচয় পাঠকগণ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

খাস আরবের বাহিরেও প্রজার ইচ্ছানুমোদিত বিচারক, রাজস্ব-সংগ্রাহক ও শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি নিযুক্ত হইতেন। অধিকন্তু হজরত ফারুক যে,

(১) كنز العمال

(২) كتاب الخراج

সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ নির্ব্বাচন-প্রথারই প্রবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত ছিলেন, নিম্নলিখিত ফরমান দ্বারা তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। কুফা, বছরা ও শামের শাসন কর্ত্তা সম্বন্ধে হজরত ওমর এক ফরমান পাঠাইয়াছিলেন। এমাম আবু ইউছুফ ছাহেব বলেন,

كتب عمر بن الخطاب الى اهل الكوفة يبعثون اليه رجلا من اخيرهم واصلحهم والى البصرة كذالك قال فبعث اليه اهل الكوفة عثمان بن فرقد و بعث اليه اهل الشام معن ابن يزيد وبعث اليه اهل البصرة الحجاج بن علاط قال فاستعمل كل واحد منهم على خراج ارضهم (১)

অর্থাৎ হজরত ওমর বিন্ খত্তাব কূফা, বছরা ও শামের অধিবাসিবৃন্দকে ফরমানের দ্বারা জানাইলেন যে; তাহাদের মধ্যে যিনি যোগ্যতম ও সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মপটু, তাঁহাকেই যেন তাঁহারা নিজেদের শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন করিয়া পাঠান। তদনুসারে যথাক্রমে কূফা হইতে ওছমান বিন্ ফরকদ, এবং শাম দেশ হইতে মা'ন বিন্ এজিদ, বছরা হইতে হেজাজ বিন্ আল্লাৎ নির্ব্বাচিত হন। হজরত ওমর ফারুক তাঁহাদিগকে রাজস্ব-সংগ্রহের ভার অর্পণ করেন।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক প্রদেশ হইতে বৎসর বৎসর স্থানীয় অভাব অভিযোগ খলিফার কর্ণগোচর করণার্থ একদল প্রতিনিধি তাঁহার নিকট আসিত। এই প্রতিনিধিদলের নাম ছিল, ওফ্‌দ। শাসনকর্ত্তা-দিগকে হজের সময়ে সমবেত করিতেন এবং আবশ্যকীয় বিষয়ে বিশেষতঃ তাঁহাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও প্রজার অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিতেন।

(১) الكتاب الخراج

প্রজার অধিকার সম্বন্ধে, যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে খলিফা হজরত ওমর ফারুকের শাসন-প্রণালীর যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে। এইক্ষণ হজরত ফারুক তাঁহার নিজের তথা শাসনকর্ত্তার যে ক্ষমতা বা অধিকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার আভাস দিব। ফারুক আ'জমের ভাষায় রাজার অধিকার এইরূপ ঃ—

إنما إنا و مالكم كولي اليتيم ان استغنيت استغففت وان افتقرت اكلت بالمعروف ـ لكم على يايها الناس خصال فخذوني بها - لكم على اجتبى شيئاً من خراجكم ولا مما افاء الله عليكم الا من وجهه - لكم على اذا وقع فى يدى ان لا يخرج منى الا فى حقه ولكم على ان ازيد فى اعطيا تكم واسد تغوركم ولكم على ان لا القيكم فى المهالك (১)

"অর্থাৎ পিতৃমাতৃহীন বালকের সম্পত্তির উপর অভিভাবকের যতদূর অধিকার, বায়তুল মাল বা রাজকোষের উপর আমার অধিকার ততদূর। ধনী হইলে বায়তুল মাল হইতে কিছুই গ্রহণ করিব না। অভাব-গ্রস্ত হইলে জীবিকা-নির্ব্বাহের যাহা দরকার, তাহাই লইব। তোমাদের অনেক দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত আছে, তজ্জন্য আমাকে তোমাদের দায়ী করা বিধেয়। আমি যেন

(১) كتاب الخراج

অন্যায়ভাবে রাজকর সঞ্চিত করিয়া না রাখি, অথবা অন্যায়ভাবে যেন ব্যয় না করি। তোমাদের সীমান্ত যেন সুরক্ষিত করিয়া রাখি।”

সাম্রাজ্যের বিভাগ

শাসক ও শাসিতের অধিকার-নির্দ্দেশের পর শাসন ও সাম্রাজ্যের যথোচিত বিভাগই সুসাশনের সাক্ষ্য। অধিকারের পর প্রাথমিক অবস্থায় শাসন, বিচার; রাজস্ব-সংগ্রহ, সৈন্য-চালনা প্রভৃতি একই ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ক্রমে ইহার বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও বিচার সুলভ করার নামই সুশাসন—ইহাই সভ্যতার চরম নিদর্শন। প্রায় দুই শত বৎসর হইতে চলিল, ইংরেজ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছে। কিন্তু আজও বৃটিশ ভারতে শাসন ও বিচার বিভাগ "হরিহরাত্মা" হইয়া রহিয়াছে। যে কলেক্টর সাহেব দেশের রাজস্ব সংগ্রহ করেন, তিনিই শাসন ও বিচারের মালিক। কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে মহারাজ ফারুক শাসন ও বিচারের যে সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তাহা ভাবিতেও মন হর্ষে ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠে। ফলতঃ পাশ্চাত্য জগৎ ইহারই অনুকরণ করিয়া আমাদের উপর সভ্যতার দান বর্ষণ করিতে আসিয়াছে।

হিজরী ২০ অব্দের পূর্ব্বে যে সকল দেশ এছলামী সাধারণ তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, হজরত ওমর ফারুক সীমা নির্দ্দেশ করতঃ তৎসমুদয়কে আট প্রদেশে বিভক্ত করেন। এই সকল প্রদেশের নাম **মক্কা, মদিনা, শাম, জজিরা, বছরা, কুফা, মিছর ও ফেলস্তিন।** এতদ্ব্যতীত ঈরান, কেরগান

খাজেস্তান প্রভৃতি যে সকল অঞ্চল এছলামী সাধারণ তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, আবশ্যক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের পর তাহার প্রত্যেকটি এক একটা প্রদেশ হিসাবে উক্ত সাম্রাজ্যের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল।

এরাক ব্যতীত পারশ্য সম্রাজ্য খোরাছান, আজর, বায়জান ও পারশ্য তিন সুবৃহৎ প্রদেশে বিভক্ত ছিল। নেশাপুর, হেরাত; মার্ব্ব, মর্ব্বেরুদ, ফারেয়াব, তল্‌কান, বলখ, বোখারা, বাদে-ঈছ, বাওর্দ্দ, গোজশ্‌তান, তুছ, ছরখছ, জর্জ্জান, নামক জেলা সমুহ লইয়া খোরাছান প্রদেশ গঠিত ছিল। তিবরস্তান, রে, কজ্‌বিন্, জঞ্জান, কেছ্‌ম্, স্পেহান, হামদান নহাওন্দ, দিনূর, হালওয়ান, মাছন্দান, মোহরজান, কজ্‌ক, শাহরজোর ছমগান ও আজর ছোবহানের সমবায়ে আজর বায়জান প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। আস্তখর, শিরাজ, নৌবিন্দজান, জৌর, কাজ্‌রুন ফছা, দারাব্‌জর, আর্দ্দ্‌শির ছাবুর, আহ্‌ওয়াজ, জন্দিছাপুর, ছুছ, নাহরতীরী, মনাজর তস্তর, ঈজজ, রামহরমুজ পারশ্যের অন্তর্ভুক্ত জেলা সমূহের নাম। হজরত ফারুক এই সকল জেলা ও প্রদেশের সীমা যথা সম্ভব পূর্ব্ববৎ বাহাল রাখিয়াছিলেন।

এই ভৌগোলিক প্রদেশ গঠনের পর প্রত্যেক প্রদেশের শাসন পরিচালনের জন্য এক একজন সুদক্ষ প্রতিনিধি নিযুক্ত বা নির্ব্বাচিত হইতেন এবং তাঁহাকে ওয়ালী (والي) বলা হইত। ওয়ালীর দফ্‌-তরের হিসাব নিকাশ ও দলিল দস্তাবেজ রক্ষার ভার যাঁহার উপর অর্পিত হইত, তাঁহাকে কাতেব (كاتب) বলা হইত। কিন্তু সৈন্য-বিভাগের হিসাব স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষিত হইত এবং যিনি তাহা রক্ষা করিতেন, তিনি "কাতেবে দেওয়ান" (كاتب ديوان) বলিয়া অভিহিত হইতেন। রাজস্ব-সংগ্রহ বিভাগের কর্ত্তা "ছাহেবুল খরাজ"(صاحب الخراج) অপরাধ অনুসন্ধান বিভাগের কর্ত্তা "ছাহেবুল আহ্‌দাছ (صاحب الاحداث)

কোষাধ্যক্ষ "ছাহেবে বায়তিল-মাল (صاحب بيت المال) আর বিচার কর্ত্তা কাজী ((قاضي) বলিয়া অভিহিত হইতেন (১) সেনাপতির পদও স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু প্রায় "ওয়ালীই" সেনাপতির কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। অনেক সময় একই ব্যক্তি একাধিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন বটে, কিন্তু বিভাগ স্বতন্ত্রই থাকিত।

(১) ابن خلكان

শাসক সম্প্রদায়

হজরত ফারুক বিভাগীয় শাসনকর্ত্তা নিয়োগে যে সাবধানতা অবলম্বন করিতেন, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। প্রত্যেক নিয়াগ-পত্রে শাসক বা কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইত। প্রত্যেক নিয়োগ-পত্রে বিভিন্ন ছাহাবীর স্বাক্ষর হইত। শাসনকর্ত্তা শাসন-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া শাসন-ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রজাবর্গের সাধারণ সভায় হজরত ফারুকের ফরমান বা নিয়োগ-পত্র পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ফলে শাসক ও প্রজার মধ্যে যেন চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইত এবং উভয়ের পরস্পর সৌহৃদ্য ও সহযোগিতায় শাসন সৌকর্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত স্বতন্ত্র বা সমবেত ভাবে শাসকদিগকে বরাবর উপদেশ দিতেন,

الا وانی لم ابعثکم امراء ولا جبارین ولکن بعثتکم ایمۃ الهدے
یهتدی بکم فادروا علے المسلمین حقوقهم ولا تضربوهم فتذلوهم
ولا تحمدوهم فتفتنوهم ولا تغلقوا الابواب دونهم فیا کل قویهم
ضعیفهم ولا تستاثروا علیهم فتظلموهم —

মনে রাখিও, আমি তোমাদিগকে কঠোর হস্ত আমিররূপে নহে, বরং তাহাদের (প্রজার) পথ প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছি, যেন তাহারা তোমাদের অনুকরণ ও অনু-

সরণ করে। তোমরা মোছলমানদিগের হক আদায় করিও, তাহাদিগকে প্রহার করিও না, পাছে তাহারা নিজেদিগকে অপমানিত মনে করে। তাহাদের অন্যায় প্রশংসা করিও না, তাহা হইলে তাহারা ভুল পথে পরিচালিত হইবে। তোমাদের দ্বার বন্ধ রাখিও না, তাহা হইলে দুর্ব্বল প্রবল কর্তৃক অত্যাচারিত হইবে। তোমরা নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিও না, কেননা, তাহাতে প্রজার প্রতি অত্যাচার হয়।

সাধারণ ভাবে নিয়োগের সময়ে প্রত্যেক কর্ম্মচারী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন, তিনি তুর্কী ঘোড়ায় চড়িবেন না, পাৎলা কাপড় পরিবেন না বা দ্বারপ্রহরী নিয়োগ করিবেন না। এক কথায় সর্ব্বপ্রকারে বিলাসিতা বর্জ্জন করিবেন এবং ফরিয়াদীর ফরিয়াদ শ্রবণের জন্য সতত দ্বার উন্মুক্ত রাখিবেন। নিয়োগের সময়ে প্রত্যেক কর্ম্মচারীর সমুদয় সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত হইত। নিয়োগের পর কর্ম্মচারীর আর্থিক অবস্থা অসম্ভবরূপে উন্নত হইলে, তাহার উচিত বিচার তদন্ত হইত। হয়তঃ কোন সভ্যতাভি-মানী ইহাকে শাসকের পক্ষে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান হানিকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যক্তিবিশেষের জন্য এরূপ ব্যবস্থা প্রচলন কোন মতেই দোষাবহ হইতে পারে না। বৃটিশ ভারতের কর্ম্মচারীবৃন্দের ঘুষ গ্রহণ সম্বন্ধে যাঁহাদের বিন্দু মাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা নিশ্চয় বলিবেন, ঘুষ-গ্রহণ-প্রথা রহিত করিবার ইহাই অমোঘ উপায়। যাঁহারা এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের পতনের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার

করিবেন ঘুষই ইহাদের পতনের মূল কারণ। ফারুক আ'জমের প্রবর্ত্তিত কঠোর শাসন দ্বারা ঘুষ-গ্রহণ-প্রথা বন্ধ হইয়া গেলে, আজ এশিয়ার এই দুর্দ্দশা হইত না, তাহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

ফারুক আ'জম এরূপ এককালীন উপদেশ দানে ক্ষান্ত হন নাই। বরং শাসক সম্প্রদায়ের জন্য নিয়ম করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক বৎসর হজের সময়ে মক্কা মোআজ্জমায় সমবেত হইতে হইবে। হজরত ফারুক হজের বিশ্ব-মোছলেম-সম্মিলনে শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রজাবৃন্দের অভিযোগের এজহার গ্রহণ করিতেন এবং যথোচিত তদারক পূর্ব্বক তাহার বিচার করিতেন।

একদা মক্কা মোআজ্জমায় হজের মহাসম্মিলনে দণ্ডায়মান হইয়া হজরত ফারুক বলিতে লাগিলেন—"ভ্রাতৃগণ, শাসনকর্ত্তাগণ এই জন্য প্রেরিত হন না যে, তাঁহারা তোমাদিগকে চপেটাঘাত করিবেন অথবা তোমাদের ধন-সম্পত্তি হরণ করিবেন। বরং রছুলের তরিকা শিক্ষাদানই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। অতএব বল, কোন শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ থাকিলে, তাহা এইক্ষণই বল। আমি তাহার যথোচিত প্রতিশোধের ব্যবস্থা করিব। এতচ্ছ্রবণে মিছরের শাসনকর্ত্তা হজরত আমর বিন আছ বলিয়া উঠিলেন, "হুজুর, যদি কোন শাসক আদব বা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে মারেন, তাঁহারও কি শাস্তির বিধান হইবে? হজরত ফারুক বলিলেন, "হাঁ, খবরদার! কোন মোছলেমকে প্রহার করিও না, তাহা হইলে তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন।"

একদা শাসকগণ হজরত ফারুকের নিকট সমবেত হইয়াছেন। এমন সময়ে জনৈক প্রজা কোন শাসকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, শাসনকর্ত্তা তাহাকে বিনা কারণে একশত বেত্রাঘাত করিয়াছেন। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইলে, হজরত

ফারুকে আ'জম সেই জনসঙ্ঘের সম্মুখে হুকুম দিলেন, সেই শাসনকর্ত্তার প্রতি একশত বেত্রাঘাত হইবে। ফরিয়াদীকে বেত্রাঘাত করিবার জন্ম ইঙ্গিত করিলেন। ইতিমধ্যে হজরত আমরের চেষ্টায় সেই শাসক ও প্রজার মধ্যে আপোষ হয়। একশত বেত্রাঘাতের পরিবর্ত্তে দুই শত সোনার আশরফী দিয়া রাজপুরুষ রেহাই পাইলেন। এতদ্ভিন্ন এবম্প্র-কারের অপরাধ অনুসন্ধানের জন্য হজরত মোহাম্মদ বিন্ মোছলেমা আন্ছারী নিযুক্ত ছিলেন। ইনি সমস্ত জেহাদে রছুলে আকরমের সহগামী ছিলেন। মহানবীর অনুপস্থিতিকালে ইনি মদিনায় হজরতের স্থলভিষিক্ত প্রতিনিধি ছিলেন। ঈরানীগণ যখন বিপুল আয়োজন সহকারে কাদেছিয়ার তুমুল সংগ্রামে মোছলমানদিগকে সগর্ব্বে আহ্বান দিতেছিল, সেই ভীষণ সঙ্কটের সময়ে কাদেছিয়া সমরের প্রধান সেনা-পতি ছা'দ বিনআবি অকাছের বিরুদ্ধে এবম্প্রকারের অভিযোগ উপস্থিত হয়। ফারুকে আ'জম বলিলেন,—"সত্য বটে এখন সময় অতি সঙ্কীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল। কিন্তু তাহা হইলেও অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান স্থগিত রাখিতে পারিব না।" এই বলিয়া তিনি হজরত এবনে মোছলেমাকে কুফা প্রেরণ করিলেন। (১) আবার কোন কোন সময়ে এরূপ অনুসন্ধানের নিমিত্ত একাধিক লোকের কমিশন নিযুক্ত হইত। রাজপুরুষ শাসক সম্প্রদায়ের শাসনের জন্য এত যত্ন অদ্যাবধি কোন রাজা মহারাজা করিয়াছেন বলিয়া জানি না। শাসক সম্প্রদায় যাহাতে নিজেদের প্রভুত্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে না পারে, হজরত ওমর ফারুক তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। বছরার শাসনকর্ত্তা আবু মূ-ার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, মদিনায় ডাকিয়া আনিয়া হজরত ফারুক

---

(১) طبری

তাঁহার প্রতি যে শাস্তির বিধান করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (১) আয়াজ বিন্ গনম পাৎলা কাপড় পরা ও প্রহরী রাখার অপরাধে পদচ্যুত হইয়া মেষ-পালনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এমনই ভাবে হজরত ওমর ফারুক শাসক ও শাসিতের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শাসক সম্প্রদায়ের শাসন ও শাসক ও শাসিতের মধ্যে সাম্যমৈত্রী প্রতিষ্ঠার্থ রাজর্ষি ফারুকের প্রচেষ্টাবলী হৃদয়-গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও, তাহার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া শাসনকর্ত্তাগণের তালিকা প্রদান করতঃ এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

(১) طبری

ওয়ালীর নাম—	শাসন-কেন্দ্র	বিশেষ কথা
আবুওবায়দা	শাম	
এজিদ্ বিন আবিছুফিয়ান	”	
মআবিয়া	”	
আমর বিন আ'ছ	মিছর	
ছা'দ বিন্ আবি অকাছ	কূফা	
ওৎবা বিন্ গজ্ওয়ান	বছরা	
আবু মুছা আশ্আরী	”	
এতাব বিন আছিদ	মক্কা মোআজ্জমা	
নাফে' বিন্ আবদুল হারেছ	”	
খালেদ বিন্ আ'ছ	”	
ওছ্মান বিন আবি আ'ছ	তায়েফ	
য়্যালী বিন্ উম্মিয়া	এমন	(১)
ওলা বিন হজরমী	”	
আয়াজ বিন্ গনম	জজিরা	
ওমর বিন্ ছা'দ	হামছ	

(১) طبری

রাজকর



প্রাক্-এছলামী যুগে আরব দেশে রাজকর আদায়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না। খায়বর বিজয়ের পর হজরত মোস্তফা সর্ব্বপ্রথমে তথাকার কৃষি-ক্ষেত্রগুলি এহুদী সম্প্রদায়ের নিকট ভাগে পত্তন করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে খায়বরের এহুদীগণ এছলাম কবুল করে। অতঃপর তাহাদিগের নিকট 'ওশর' বা উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। রছুলুল্লার জীবদ্দশায় এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কর-স্থাপনের ব্যবস্থা হয় নাই। প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিকও রাজকর-নির্দ্ধারণের কোন সুযোগ পান নাই। খেলাফতের প্রথম ভাগে হজরত ওমর ফারুকও এতৎপ্রতি যথোচিত মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিজিত রাজ্যসমূহের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল রাজ্যের সুবন্দোবস্তের জন্য হিজরী ১৬ অব্দে তিনি রাজস্ব-নির্দ্ধারণের প্রতি মনোযোগী হইলেন। একে রাজকর আরবের নিকট অপরিচিত ও অপরিজ্ঞাত; তদুপরি সৈনিক ও সেনাপতিগণ বিজিত রাজ্যসমূহকে তাঁহাদেরই সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিতে লাগিলেন। হজরত আবদুর্ রহমান বিন্ আউফ প্রমুখ বড় বড় ছাহাবীগণ পর্য্যন্ত সৈনিকদিগের সমর্থন করিলেন। হজরত আবদুর্ রহমান বলিতে লাগিলেন, "যাহাদের তরবারিতে রাজ্য জয় হইয়াছে, তাহারাই তাহা ভোগ করিবে, অন্যের পক্ষে তাহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।" কিন্তু হজরত আলী, হজরত ওছ্মান ও

হজরত তল্‌হা হজরত ফারুকের মতাবলম্বী ছিলেন। এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সাধারণ সভা আহুত হইল। কয়েক দিন ধরিয়া দুই পক্ষের বাদানুবাদ ও যুক্তিতর্ক চলিতে লাগিল। অবশেষে হজরত ওমর ফারুক বহু যুক্তিতর্কসহকারে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার মতে অধিবাসীগণই "ভূমির প্রকৃত মালিক এবং ভূমি তাহাদেরই ভোগ্য। অবশ্য দেশকে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ও আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার নিমিত্ত রাজকর নির্দ্ধারিত হওয়া বিধেয়।" (১) ফারুকে আজ'মের এই বক্তৃতা শ্রবণে সেনাপতি ও তাঁহাদের সমর্থকগণ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর তাঁহারা এক বাক্যে হজরত ফারুকের মতে সায় দিলেন। বিশাল এছলামী সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

এরাক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে হজরত ফারুক তথাকার লোক-গণনার আদেশ করেন। হজরত ছা'দ বিন্ আবি অকাছ বিশেষ দক্ষতার সহিত গণনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এইক্ষণ হজরত ফারুক বিজিত রাজ্যের জরিব-পয়মায়েশ ও বন্দোবস্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে এরাকের পয়মায়েশ আরম্ভ হইল। ওছমান বিন্ হানিফ ও হজিফা বিন্ য্যামান পয়মায়েশের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। খলিফা হজরত ওমর স্বহস্তে মাপ-কাঠি প্রস্তুত করিয়া দিলেন। কয়েক মাসের অনবরত পরিশ্রমের ফলে পয়মায়েশের কার্য্য সম্পন্ন হইল। এরাকের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল। এরাক দেশ দৈর্ঘ্যে ৩৭৫ মাইল এবং প্রস্থে ২৪০ মাইল। পর্ব্বত প্রস্রবণ ও মরুভূমি ব্যতীত কৃষির উপযোগী ক্ষেত্রের পরিমাণ সাব্যস্ত হইল, ৩৬০০০০০০ জরিব। (২) কাজী আবু ইউছুফ ছাহেব

---

(১) طبری (২) জরিব = পৌণে বিঘা।

বলেন, মূল্যবান বস্ত্র পরিমাপের ন্যায় একান্ত যত্ন সহকারে এরাকের জরিব পয়মাশের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

অতঃপর রাজর্ষি হজরত ফারুক ভূমির পত্তন ও কর-নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। হজরত ফারুক প্রথমতঃ ঈরাণী সম্রাটদিগের প্রথা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোব্‌বাদ ও নওশেরওয়াঁর নির্দ্ধারিত কর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, পরবর্ত্তী সম্রাটগণ বৃদ্ধি করিয়া থাকিলেও, নওশেরওয়াঁর সময়ে এই ব্যবস্থা ছিল যে, কোন অবস্থাতেই উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেকের বেশী কর স্থাপন করা অন্যায় বিবেচিত হইবে। হজরত ফারুক শাহী জায়গীর ও লাওয়ারেছ ভূমি জনহিতকর কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং বন-জঙ্গল ও পতিত ভূমি "খালেছা" বা খাসভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। অবশিষ্ট ভূমি পূর্ব্বে যাহাদের অধিকারে ছিল, তাহাদের দখলে ছাড়িয়া দিয়া নিম্নহারে কর নির্দ্ধারণ করিলেন।

উৎপন্ন শস্যের নাম	ফিঃ জরিব কর	বিশেষ কথা
গোধূম	২ দেরহাম	ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হিসাবে কোন কোন স্থানে এই হারের পরিবর্ত্তন হইত।
যব	১ "	
ইক্ষু	৬ "	
তুলা	৫ "	
আঙ্গুর	১০ "	
খোরমা	১০ "	
তিল	৮ "	
শাকসব্জী	৩ "	

পূর্ব্বে ঈরান দেশে মরজবান ও দেহ্‌কান্‌ নামে দুই শ্রেণীর মধ্য-স্বত্বাধিকারী ছিল। ইহারা ঠিক যেন বাংলা দেশের জমিদার এবং তালুকদার। পার্থক্য মাত্র এই যে, এদেশের প্রজার নিকট জমিদার যদৃচ্ছা রাজস্ব উসুল করিতে পারেন। তাঁহাদের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে প্রজাকে রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা এদেশের রাজশক্তি করেন না। পারস্যের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনেও কিন্তু বাংলার ন্যায় প্রজার প্রতি এত বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার অবিদিত ছিল। যাহা হউক, সে সব বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে। আমাদের বক্তব্য এই যে, হজরত ফারুক ঈরানের প্রাচীন প্রথানুসারে এরাকের জমিদার ও তালুকদারদিগের অধিকার স্বীকার পূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বপদে বহাল রাখিয়াছিলেন।

হজরত ফারুকের নূতন বন্দোবস্তির ফলে কৃষকগণ বিশেষ উৎসাহিত ও আশ্বস্ত হইল। বন্দোবস্তির প্রথম বৎসর মোট রাজস্ব উসুল হইল, ৮০০০ আট হাজার দেরহাম। দ্বিতীয় বৎসর আরও ২০০০ দুই হাজার দেরহাম অধিক উসুল হইল। ফলে রাজস্বের পরিমাণ ১০০০০ দশ হাজার দেরহামে গিয়া দাঁড়াইল। প্রজাবৎসল রাজা হজরত ফারুক একদিকে যেমন রাজস্ব উসুলের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অন্যদিকে প্রজার অবস্থার প্রতিও তেমন বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। সংগৃহীত রাজস্ব মদিনায় উপস্থিত হইলে, তিনি কূফা ও বছরা হইতে দশ দশ জন করিয়া বিশিষ্ট বিশ্বাসী ও সত্যবাদী লোককে আহ্বান করিতেন। রাজস্ব সংগ্রহে প্রজার প্রতি কোনরূপ অবিচার অত্যাচার হইয়াছে কিনা, তাহাদের নিকট বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিতেন। কূফা ও বছরার প্রজা-প্রতিনিধিগণ চার চার বার হলফ করিয়া বলিতেন যে, রাজস্ব সংগ্রহে কোন প্রকার উৎপীড়ন হয়

নাই। তখনই এবং তখন মাত্র হজরত ফারুক রাজস্বের অর্থ গ্রহ করিতেন। (১)

এরাক ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশেও রাজস্ব-সংগ্রহ সম্বন্ধে হজরত ফারুক তথাকার পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা বহাল রাখিয়াছিলেন। এমন কি ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার নিযুক্ত কর্ম্মচারীবৃন্দের দ্বারাই রাজস্ব সংগৃহীত হইত। দফ্তরের ভাষাও পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। এতদনুসারে এরাক ও পারশ্য দেশে পারসী, মিছরে কবতী এবং শামে রোমান ভাষাই সরকারী ভাষারূপে গৃহীত হয়। অবশ্য পূর্ব্ব-প্রচলিত প্রথার গলৎগুলি বিচক্ষণ ফারুকের নজর এড়াইতে পারে নাই।

রোমক-বিজয়ের পূর্ব্বে মিছরে চারসালা বন্দোবস্তি ছিল। রাজকর নির্দ্দিষ্ট অর্থ অথবা উৎপন্ন শস্যের দ্বারা উসুল করিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু রোমকগণের অধিকারের পর সৈন্যদিগের বড় বড় জায়গীর প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমক শাসনে নির্দ্দিষ্ট কর ব্যতীত সৈনিক ও কুস্তুন্তুনিয়ার দরবারের নামে অতিরিক্ত "ফাউ" তুলিবার নিয়ম হইয়াছিল। হজরত ফারুক প্রথমতঃ শেষোক্ত অতিরিক্ত কর রহিত করিয়া দেন। অনন্তর এই বলিয়া চারসালা বন্দোবস্তি উঠাইয়া দিলেন যে,নীল নদীর করুণা ও কার্পণ্যের উপরই ফসলের উৎপাদন নির্ভর করে এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণে বৎসর বৎসর বিষম তারতম্য হয়। ইহাতে প্রজাই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতঃপর হজরত ফারুক নিয়ম করিলেন, প্রত্যেক কিস্তির সময়ে পরগণার বিশিষ্ট ও বিশেষজ্ঞদিগের নিকট ফলিত ফসলের অবস্থা জানিয়া কর নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। (২)

(১) كتاب الخراج

(২) مقريزى

হজরত ফারুক রোমক সৈন্যদিগের জায়গীর ও অতিরিক্ত কর-প্রথা রহিত করিয়া দিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। মোছলেম মোজাহেদীন এই প্রথার সুবিধা ভোগ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় হজরত ফারুক ঘোষণা করিয়া দিলেন, মিছরের ভূমির প্রতি আরবের কোন স্বত্ব জন্মিবে না। এমন কি তাঁহারা কোন কবতীর স্বত্ব খরিদ করিতে পারিবেন না। আর এক ফরমানের দ্বারা খলিফা ঘোষণা করিলেন যে আরবগণ কৃষিকার্য্য করিতে পারিবেন না। (১) স্থূল দৃষ্টিতে অনুমিত হইবে যে, হজরত ফারুক বিজিত প্রজার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে গিয়া আরবদিগের প্রতি সুবিচার করেন নাই। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ইহা অন্যরূপ প্রতিপন্ন হইবে। কারণ একে কৃষিকর্ম্ম আরবদিগের স্বভাব-বিরুদ্ধ। কাজেই কৃষির দ্বারা লাভবান হওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ নহে। উপরন্তু দূর ও সূক্ষ্মদর্শী মনীষী চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, আরবগণ একবার কৃষির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলে,—ভূমির প্রতি তাহাদের মমত্ববোধ জন্মিয়া গেলে,—হয়ত তাঁহারা আরবের বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিবেন এবং তিনি যে মহা কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার পথে উহা বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসই ইহার সাক্ষী। যে দিন আরবগণ কৃষির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন, সেদিন হইতে তাঁহাদের অধঃপতনের প্রথম সূচনা।

বিজিত দেশের বন্দোবস্তি-সংক্রান্ত ব্যাপারে ফারুকে আ'জম অধিবাসীর মতামত সংগ্রহে সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। পদে পদে তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মিছর ও এরাকের বন্দোবস্তির সময়ে তথাকার প্রধান ও বিশেজ্ঞদিগকে মদিনায় আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞগণ সানন্দে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। (২)

(১) مقریزی (২) کتاب الخراج

বন্দোবস্তি-কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে হজরত ওমর ফারুক পতিত ভূমির আবাদের প্রতিও যথোচিত মনোনিবেশ করেন। পতিত জমি সম্বন্ধে তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে যাহা অবাদ করিবে উহাতে তাহারই স্বত্ব জন্মিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন পতিত জমির উপর অধিকার স্থাপন করিয়াও তিন বৎসরের মধ্যে আবাদ করিবে না, উহাতে তাহার দাবী থাকিবেনা। এই রাজকীয় ঘোষণার ফলে অতি অল্পকালের মধ্যে বহু পতিত ভূমির আবাদ হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের সময়ে যে সকল কৃষক নিজেদের আবাদী ভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হইল, তাহারা যেন ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব কৃষিভূমি অধিকার করিয়া লয়।

কৃষির উন্নতির জন্য হজরত ফারুক নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন; অসংখ্য খাল ও পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন এবং কত নদী ও খালে বাঁধ বাঁধাইয়াছিলেন, তাহারও সংখ্যা নাই। এক মিছর দেশে এক লক্ষ বিশ হাজার শ্রমিক সম্বৎসর এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। (১) কৃষির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হজরত ফারুক কতদূর যত্ন লইতেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হইবে। কোন কৃষক আসিয়া হজরত ফারুকের সম্মুখে নিবেদন করিল যে, "শামদেশে সৈন্য চালনার সময়ে, আমার কিছু কৃষি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" খলিফা হজরত ফারুক তখনই উহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাহাকে পাঁচ হাজার দেরহাম দান করেন। (২)

উপরে যে রাজস্বের কথা উল্লিখিত হইল, উহা সাধারণতঃ জিম্মী বা অমোছলমান প্রজাগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা মোছলমান প্রজার নিকট "ওশর" বা উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ রাজস্বরূপে গ্রহণ করার ব্যবস্থা

(১) مقریزی (২) کتاب الخراج

ছিল। ইহার কারণ এই যে, মোছলমান প্রজাদিগের ভূমির "ওশর" রাজস্বের উপর জকা'ৎ নামে আর একটী স্বতন্ত্র কর নির্দ্দিষ্ট ছিল। সঞ্চিত শস্য, সঞ্চিত অর্থ, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি সকল প্রকার সম্পত্তির উপর জকা'ৎ দান মোছলমানের প্রতি ফরজ। এমতাবস্থায় রাজস্বের পরিমাণ দশমাংশের বেশী হইলে, মোছলেম-প্রজার পক্ষে রাজকর-ভার দুর্ব্বহ হইত। তথাপি হজরত ফারুক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, মোছলমানদিগের কৃষিকার্য্যে প্রাচীন খাল কূপের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইলে, সেই সকল কৃষিভূমির জন্য মোছলমানদিগকেও সাধারণভাবে রাজস্ব আদায় করিতে হইবে।

অন্যান্য কর



রাজস্ব ব্যতীত রাজকোষের আয়ের মধ্যে জকা'ৎ, আশূর, জিজিয়া প্রভৃতি রাজকর নির্দ্ধারিত ছিল। জকা'ৎ শুধু মোছলমানদিগেরই দেয়, জকা'তের কোন পরিচয় অনাবশ্যক। আমরা এই অধ্যায়ে আশূর ও জিজিয়া সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আশূরের ইতিহাস এই যে, মোছলমানগণ এছলামী সাম্রাজ্যের বাহিরে ভিন্নদেশে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে গেলে, সেখানে তাহাদিগকে পণ্যদ্রব্যের জন্য শত-করা দশ দেরহাম হিসাবে কর দিতে হইত। হজরত ফারুক সেই সকল দেশের ব্যবসায়ীগণের প্রতি ঠিক তদনুপাতে কর নির্দ্ধারণ করিলেন। এই কর বা ডিউটী আশূর নামে পরিচিত। অতঃপর হজরত ফারুক অন্তর বাণিজ্যের প্রতিও এই কর প্রচলন করেন। অবশ্য শেষোক্ত করের পরিমাণ অনেক কম ছিল। এই বাণিজ্য-কর উসুলের জন্য এক স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইল। এতৎসম্বন্ধে ফারুকে আ'জম আরও নিয়ম করিলেন, ব্যবসায়ীর আসবাব পত্রের কর দিতে হইবে না। রাজ্যের যে কোন অংশে পণ্য দ্রব্যের উপর একবার আশূর উসুল করা হইলে, সেই পণ্য অন্যত্র স্থানান্তরিত হইলে সওদাগরদিগকে আর কোনরূপ কর দিতে হইবে না। দুই শত দেরহামের কম মূল্যের পণ্যের উপর কোন প্রকার কর ধার্য্য হইবে না।

আমাদের দেশে জিজিয়ার নাম হইয়াছে, ঘৃণাসূচক কর

এদেশের ইতিহাসে এবং সাহিত্যে এই কল্পিত ঘৃণার নামে এছলামের ও এছলামের চিরস্মরণীয় রাজন্যবর্গের প্রতি কত অলীক ও অযথা দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহার শুমার নাই। কোমলমতি বালক বালিকাদিগকে পাঠশালার শিক্ষকবর্গ বলিয়া দেন যে, এছলামে অমোছলমানকে ভালবাসিবার কোন শিক্ষা-বিধান নাই, তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ—জিজিয়া নামক ঘৃণাসূচক কর। নিজের ধর্ম্মমত পোষণ করার অপরাধে এছলামী সাম্রাজ্যে প্রত্যেক অমোছলমানকে এই কর দিতে হয়। বস্তুতঃ এদেশের শিক্ষা প্রণালীর মধ্যস্থতায় জিজিয়া করকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়া প্রচার করা হইয়াছে, তাহাতে উহার স্বরূপ একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে।

পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে-দেশের লোক ভূ-করের উপর জলকর, ফলকর, নুনকর, বনকর, আয়কর, পথকর (Road cess), ঘরকর (Public works cess), মুন্সীপাল কর (Municipal tax), চৌবদার কর (Chowkideri tax), সালামী কর (Punitive tax), বিচার-কর (Court fee) দলিল-কর (Registration fee), প্রভৃতি কর এবং যুদ্ধ, শান্তিউৎসব ও রাজপুরুষদিগের অভ্যর্থনা উপলক্ষে রকম রকম চাঁদা দানে অভ্যস্ত, তাহারা জিজিয়া করের নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠে। পরাধীন জাতির বিচার-শক্তি এমনই ভাবে লোপ পায়। পরাধীন মানুষ মনিব-জাতি কল্পিত মিথ্যাগুলিকে এমনইভাবে আনুপূর্ব্বিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। প্রকৃতপক্ষে জিজিয়া ঘৃণাসূচক নহে বরং এছলামী আইনের উদারতার নিদর্শন। এছলাম দেশ ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্ত জেহাদকে তাহার সন্তানবর্গের প্রতি ফরজ করিয়াছে। এছলামের আদেশ এছলামের সন্তানের প্রতিই বলবৎ। সুতরাং এই আদেশে অমোছলমান বাধ্য নহে। তাই তাহাকে বাধ্যতামূলক সৈনিক-বৃত্তি হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। অথচ তার দেশকে বহিঃশত্রুর

আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ভার মোছলেম-সন্তানগণের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। দেশ-রক্ষায় মোছলেম-সন্তানের এই যে শ্রম ও জীবনদান, এই সামান্য জিজিয়া করের বিনিময়ে। জিজিয়া কর যে, অমোছলমান প্রজাকে বাধ্যতা মূলক সৈনিক-বৃত্তি হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্তই স্থাপিত, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। এহুদী বনুতগ্লব বংশ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া, তাহাদিগকে জিজিয়া হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। য়্যারমুক যুদ্ধের সময়ে দেমস্ক ও হামছের সংগৃহীত জিজিয়া করের অর্থ কি-ভাবে কড়ায় গণ্ডায় এহুদীদিগকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ সেই যুদ্ধের বিবরণেই পাঠ করিয়া আসিয়াছেন। হিজরী ১৭শ অব্দে এরাকের শাসনকর্ত্তার নামে হজরত ফারুক যে ফরমান পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে,

يستعنوا بمن احتاجوا اليه من الا ساورة ويرفعوا عنهم الجزاء

অর্থাৎ যাহাদের নিকট সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে জিজিয়া হইতে মুক্তি দাও।

আরমেনিয়াবাসীর সহিত যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহাতে হজরত ফারুক লিখিয়া দিয়াছিলেন,

وعلى اهل ارمنية ان ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل امر ناب اولم ينب راه الوالى صلاحا على ان توضع الجزاء

অর্থাৎ আরমেনিয়াবাসিগণকে ওয়ালীর আদেশ নির্দ্দেশ মতে আবশ্যক বশতঃ প্রত্যেক যুদ্ধে যোগদান করিতে হইবে। তাহাদিগকে জিজিয়া কর দিতে হইবে না।

জর্জ্জিয়া-বিজয়ের পর খলিফা হজরত ওমর নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রচার করেন,

ان لكم الذمة وعلينا المنعة على ان عليكم من الجزاء فى كل سنة على قدر طاقتكم ومن استعنابه منكم فله جزاءه فى معونة عوضا عن جزائه

অর্থাৎ তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমরা দায়ী। তোমরা তাহার পরিবর্ত্তে আপন আপন শক্তি অনুসারে জিজিয়া দান করিবে। (দেশ রক্ষায়) তোমরা যদি আমাদের সাহায্য কর, তবে তোমাদিগকে জিজিয়া দিতে হইবে না। (১)

প্রিয় পাঠক পাঠিকে! রাজর্ষি হজরত ওমর ফারুকের ঘোষণাবাণী হইতে বোধ হয় জিজিয়া করের যথার্থ পরিচয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই জিজিয়া-কর ঘৃণাসূচক অথবা এছলামী কানুনের উদারতার পরিচায়ক, তাহা আপনারা নিজেরাই বিচার করুন।

একবার কোন তার্কিককে বলিতে শুনিয়াছিলাম, ভূমি-রাজস্বের অর্থে কি দেশ রক্ষা করা চলে না, জিজিয়ার আবশ্যকতা কি? এই সকল অন্ধবিশ্বাসী তার্কিকের উত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দেশে কৃষক ভিন্ন আরও অনেক শ্রেণীর লোক বাস করে। শুধু কৃষকের অর্থে যদি দেশ রক্ষা করা হয়, তাহা হইলে কি গরীব কৃষকের প্রতি অত্যাচার হয় না? শিল্পী ব্যবসায়ীরা কি দেশ-রক্ষার জন্য দায়ী নহে?

(১) طبرى

নজারৎ



পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা রাজকীয় আয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এইক্ষণ হজরৎ ফারুকের ব্যয় ও সঞ্চয়-পদ্ধতি পাঠকগণের গোচর করিব।

মহাত্মা হজরত আবুবকর ছিদ্দিকের খেলাফৎ-কালে রাজকোষ বা ধনাগার স্থাপিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার অফাতের সময়ে রাজকোষে এক দের্‌হাম মাত্র সঞ্চিত ছিল। হজরত ওমর ফারুকের খেলাফৎ-কালে রাজকীয় আয়ের পরিমাণ যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় সম্বন্ধে তিনি ছাহাবীগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। অলিদ বিন্ হেশাম বলিলেন,—"আমি দেখিয়াছি যে, শামদেশে রাজকোষ রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ আছে।" হজরত ফারুকের নিকট ইহা পছন্দ হইল। মদিনায় "বায়তুল মাল" স্থাপিত হইল। বায়তুল মালের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত হইল, স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইল। কেন্দ্রীয় বায়তুল মালের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আবদুল্লাহ্ বিন্ আরকমের উপর ছোপর্দ্দ হইল। কালে প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক বায়তুল-মাল প্রতিষ্ঠিত হয়। বায়তুল মালের পরিদর্শন সম্বন্ধে হজরত ওমর ফারুক যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন; তাহার বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাসকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। পুস্তকের কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা তাহার আলোচনা হইতে নিবৃত্ত রহিলাম।

ব্যয়ের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রথমতঃ নজারৎ বা পাব্লিক ওয়ার্কস্ সম্বন্ধে

আলোচনা করা যাউক। "পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট" নামে যে বিভাগ আধুনিক গবর্ণমেণ্টের আছে, হজরত ফারুকের খেলাফৎ-কালে ঠিক তদ্রূপ কোন স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল'না সত্য, কিন্তু বিভিন্ন বিভাগের অধীন ঐ সকল জনহিতকর কার্য্য অতি উত্তমরূপে সমাধা হইত। রাজকর-প্রথার আলোচনা-প্রসঙ্গে পাঠকগণ দেখিতে পাইয়াছেন যে, হজরত ফারুক কৃষির উন্নতির জন্য কতদূর যত্নবান ছিলেন। ফারুকে আ'জমের এই সকল কার্য্যের আলোচনা স্বতন্ত্র পুস্তক-রচনা ব্যতীত সম্ভবপর নয়। অতএব আমরা নজারৎ বিভাগের কয়েকটি কার্য্যের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

এই বিভাগে প্রত্যেক প্রদেশে অসংখ্য খাল. প্রণালী ও কূপ খনন করা হয় এবং অসংখ্য মঞ্জিল ও বাঁধ নির্ম্মিত হয়।

বছরায় ৯ মাইল বিস্তৃত যে খাল খনন করা হয়, তাহা তথাকার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা আবু মূছা আশআরীর নামানুসারে "**নাহরে আবি মূছা**" নামে খ্যাত। এই খালের সাহায্যে দিজ্‌লা হইতে বছরার স্থলভাগে জল সরবরাহ করা হইত। ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে, এই খাল খননের পূর্ব্বে বছরা ভীষণ মরু-প্রান্তর ছিল। হজরত ফারুকের আদেশে এই খাল খনন করা হইলে, সেই মরু-প্রান্তর উর্ব্বর ও শস্যশ্যামল হইয়া উঠে।

নাহ্‌রে মা'কল বছরা প্রদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ খাল। ফারুকে আ'জম এই খাল-খননের ভার মা'কল বিন্ য়্যাছারের জিন্মায় দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারই নামানুসারে ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করে।

নাহ্‌রে ছা'দ কূফার অন্যতম প্রসিদ্ধ খাল। ইহাও হজরত ওমরের আদেশে খনন করা হয় এবং তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা ছা'দ বিন্ অকাছের নামানুসারে ইহার নাম রাখা হয়।

নাহরে আমিরুল মো'মেনীন মিছর ও মদিনার

যাতায়াত সহজ করিবার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৬৯ মাইল।

এই প্রসঙ্গে সুয়েজ খাল সম্বন্ধে হজরত ওমর ফারুকের অভিমত পাঠকগণের গোচরীভূত করিলে বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না। মিছরের শাসনকর্ত্তা আমর-বিন-আ'ছ খলিফার দরবারে সুয়েজ খাল খননের অনুমতি ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু খলিফা হজরত ওমর ফারুক এই বলিয়া অনুমতি দানে অস্বীকার করেন যে, তাহা হইলে "ইউনানী নৌবহর আরবে প্রভাব বিস্তার করিবে।"

মছজেদ। হজরত ফারুকের খেলাফৎ-কালে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৪০০০ চার হাজার মছজেদ-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সরকারী গৃহ। দারুল্ এমারা, বায়তুল মাল, কারাগার, দেওয়ান,সেনা-নিবাস মেহমান-খানা প্রভৃতি সরকারী অর্থে নির্ম্মিত হইত। অবশ্য ইহা বলাই বাহুল্য যে, আমাদের দেশের সার্কিট হাউসের ন্যায় এই সকল গৃহ তেমন জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না।

কূফা, মোছাল, ফস্তাৎ প্রভৃতি শহরের পত্তনও এই নজারৎ বিভাগের কার্য্যাবলীর শামেল।

সেনা-বিভাগ



প্রাক্ এছলামী যুগে কোন দেশে নিয়মিত সৈন্যদল গঠনের ব্যবস্থা ছিল বলিয়া জানি না। আরবের এমন বাদশাহ্দিগের মতে সৈন্যগণই লুণ্ঠিত সম্পত্তির মালিক। রাজাকে কিছু নজর দিয়া লুণ্ঠিত সম্পত্তিগুলি তাহারা আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইত। বিজিত দেশ লুণ্ঠিত সম্পত্তির মধ্যেই গণ্য ছিল। ইউরোপের সর্ব্বত্র এই নিয়মই প্রচলিত ছিল। অবশ্য রোমকগণ পারশ্যের অনুকরণে ইহার কিছু রদবদল করিয়া ফিউডেল সিষ্টেম (Feudal System) স্থাপন করেন। ফলে দেশের প্রধানগণই দেশের মালিক হইতেন। যুদ্ধ-কালে তাঁহারা রাজাকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিতেন। সুযোগ পাইলে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন পূর্ব্বক তাঁহারাই স্বয়ং রাজা হইয়া বসিতেন।

প্রথম খলিফার শাসন-কালেও সেনা-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সৈন্যদিগের কোন তালিকা ছিল না, তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন ছিল না। প্রবল প্রতাপশালী শত্রুবর্গের কবল হইতে এছলামকে রক্ষা করিবার মানসে প্রত্যেক মোছলমান আপন আপন জান-মাল আল্লাহ্ তাআলার পথে উৎসর্গ করিতেন মাত্র। হজরত ফারুক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, ইহার শৃঙ্খলা-বিধান একান্ত আবশ্যক। অবশেষে হিজরী ২৫শ অব্দে মজলিছে-শূরার সম্মুখে তিনি এই বিষয় উপাস্থাপিত করেন। তিনি বলিলেন, প্রত্যেক মোছলমান এছলামী ফৌজের এক এক জন

সিপাহী। এইক্ষণ তাহাদিগকে কি ভাবে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহাই মাত্র বিচার্য্য। অতঃপর তিনি মোখ্‌রমা বিন্ নৌ ফল, যবীর বিন্ মোআত্তম ও আকিল বিন্ আবিতালেবকে এছলামী ফৌজের তালিকা গঠনে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা প্রথমতঃ কোরেশ ও আনৃছারদিগের তালিকা প্রস্তুত করতঃ হজরত ফারুকের সমীপে উপস্থিত করিলেন।

হজরত ফারুক দেখিলেন, তাহাতে বনু হাশেমের পর যথাক্রমে হজরত আবুবকর ও হজরত ওমরের এবং তারপর অন্যান্য বংশের লোকের নাম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। হজরত ফারুকের তাহা পছন্দ হইল না। তিনি আদেশ করিলেন, **"আকা মোস্তফার নৈকট্য হিসাবে সমস্ত মোছলমানের নাম একই তালিকাভুক্ত হইবে। এই ক্রমিক হিসাবে যথাস্থানে আমার নামও সন্নিবেশিত করিও।"** অবশেষে এই আদেশানুসারে তালিকা প্রস্তুত হইল। (১) অতঃপর এই এছলমী বাহিনীকে ফৌজে নেজাম (فوج نظام) ও মতুআ (مطوعه) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল এবং গুণানুসারে তাহাদের বেতন নির্দ্দিষ্ট হইল। (২) মদিনা, কূফা, বছরা, মোছল, ফস্তাত, দেমস্ক, হামছ, আরদন ও ফেলস্তিনে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। আবশ্যক সেনা-নিবাস নিৰ্ম্মিত হইল।

এছলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সেনাপতি নির্ব্বাচন করতঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবার বিশেষ কোন নিয়ম ছিল না। সর্ব্বপ্রথমে আরব মোছলমানগণই ইহাকে বাধ্যতামূলক নিয়মে পরিণত করেন। রণ-বিশারদ বীর হজরত খালেদ বিন্ অলিদের যত্নে বাহিনীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া

---

(১) طبری و مقریزی

[২] فوج نظام = Regular. مطوعه = Volunteer.

লড়িবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলেও, প্রথম খলিফার শাসনকালে তাহা বিশেষ কোন নিয়মাধীন ছিল না। হজরত ফারুক এই সকল দলের অবস্থানাদি হিসাবে নিম্নরূপ বিভাগের সৃষ্টি করেন,—

নাম		পরিচয়
কল্ব	(قلب)	দেহরক্ষী।
মোকদ্দমা	(مقدمه)	অগ্রভাগ।
মায়মনা	(ميمنه)	দক্ষিণ।
মায়ছয়া	(ميسره)	বাম।
ছাকা	(ساقه)	পশ্চাদ্ভাগ।
তলীআ	(طليعه)	শত্রুসৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে নিয়োজিত দল।
রেদা	(ردء)	সর্ব্বপশ্চাদ্ভাগ।
রায়েদ	(رائد)	রসদ-বাহী।
রোক্বান	(ركبان)	উষ্ট্রারোহী।
ফর্ছান	(فرسان)	অশ্বারোহী।
রাজেল	(راجل)	পদাতিক।
রোমাত	(رماة)	তীরান্দাজ।

এতদ্ভিন্ন পরিখা খনন ও যুদ্ধ-পথ নির্ম্মাণাদি কার্য্যে বহু সংখ্যক লস্কর এবং শত্রুসৈন্য ও শত্রুদেশের সংবাদাদি সংগ্রহের জন্য বহু সংখ্যক জাছুছ নিয়োজিত হইত।

এই সৈন্যদল গঠন প্রথমতঃ কোরেশ এবং আন্‌ছার হইতে আরম্ভ হইলেও, কালে সমস্ত আরববাসী শ্রেণীভুক্ত হয়। এছলামী সাম্রাজ্যের অমোছলমান প্রজাগণও অনেকে স্বেচ্ছায় সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল। এমনকি এক দল ভারতবাসী গিয়াও এছলামী ফৌজে দাখেল হইয়াছিল। শত শত অমোছলমান স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া যথারীতি বৃত্তিভোগ করিত। সৈনিকবৃন্দের শাসন ও সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রত্যেক সেনা-নিবাসের সমস্ত ফৌজ কয়েক দলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দলে এক এক জন করিয়া আমির থাকিতেন। এই আমির সাধারণতঃ আমিরুল আ'শার امیرالاعشار নামে অভিহিত হইতেন। বেতন বিতরণের জন্য প্রত্যেক দলে এক এক জন করিয়া আরিফ عریف ((Pay Master) থাকিতেন। তিনি কাতেবে দেওয়ানের নিকট সৈনিকবৃন্দের শনাখ্‌ত করিতেন। সন্তরণ, অশ্বারোহণ, তীরনিক্ষেপ ও পদব্রজে ভ্রমণ প্রত্যেক সৈনিকের সাধারণ শিক্ষার মধ্যে গণ্য ছিল। (১) আবশ্যক যুদ্ধাস্ত্রাদি প্রত্যেক সৈনিককে স্বয়ং বহন করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত নিজের আবশ্যক পরিচ্ছদ, সুই সুতা এবং কাঁচি প্রভৃতিও সঙ্গে রাখিতে হইত। প্রত্যেক শুক্রবার সৈনিক-বৃন্দের বিশ্রাম-দিবস বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। প্রত্যেক সৈনিক অন্ততঃ বৎসরে একবার করিয়া ছুটি পাইত। সৈনিকবৃন্দের স্বাস্থ্যের প্রতি হজরত ফারুক অতিশয় যত্নবান ছিলেন। এতন্নিমিত্ত স্বাস্থ্যকর স্থানেই সেনা-নিবাস নির্ম্মিত হইত। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদিগকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা ছিল।

---

(১) ইহা শুধু সৈনিকের শিক্ষণীয় নহে; বরং প্রত্যেক অসৈনিক মোছলমানের পক্ষেও ইহা ছুন্নত। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে রছুলেমকবুলের এই উপদেশের অর্থ চতুর্ব্বিধ শরীর-চর্চ্চা।

হজরত ফারুক যুদ্ধবিদ্যা ও যুদ্ধাস্ত্র সমূহের অনেক উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল নূতন নূতন যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার চিত্র সহ বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

অশ্বের লালন পালন সম্বন্ধে হজরত ফারুক অতিশয় যত্নবান ছিলেন। মদিনা-কেন্দ্রের অশ্বসমূহের পরিদর্শনের ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। মদিনার অদূরে এক বিস্তৃত গোচারণ-ভূমি স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক অশ্বের রানে جيش فى سبيل الله খোদিত থাকিত। কূফায় অশ্ব পালনের ভার অর্পিত হইয়াছিল, ছল্‌মান বিন্‌ রবিয়ার প্রতি। ইনি অশ্ব পালন ও অশ্ব পরিচয়ে-বিশেষজ্ঞ বলিয়া আরবময় বিখ্যাত ছিলেন। তিনি আরবী ও আ'জমী ঘোড়ার সংমিশ্রণ যাহাতে না ঘটিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। অপরাপর কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানেও হজরত ফারুক কোন ত্রুটি করেন নাই। (১)

(১) طبری

আইন ও বিচার



সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন হইতে মানুষ সমাজের সহিত তাহার ব্যক্তি-গত সম্বন্ধ ও অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে। এই সম্বন্ধ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক সমাজে যে বিচার-প্রথার প্রচলন ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। অবশ্য দেশ ও কাল ভেদে বিচার-বুদ্ধি ও বিচার-প্রথা পৃথক পৃথক ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু বিচার-নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল না। সর্ব্বপ্রথমে রোমানগণই বিচার-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে বিশেষ সফলকাম হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ইতিহাস তাঁহাদের সাফল্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখে নাই। বস্তুতঃ এছলামের কল্যাণে জগতে আইন ও বিচার-বিধানের প্রথম সৃষ্টি হয়। রোমকদিগের কল্পনাকে সর্ব্বপ্রথমে হজরত ওমর ফারুকই কার্য্যে পরিণত করেন। নিম্ন লিখিত ফরমানের দ্বারা হজরত ওমর ফারুক বিচার-নিয়ন্ত্রণের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন,—

اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة اس بين الناس فى وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف فى حيفك البينة على من ادعى واليمين على من انكر والصلح جايز الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لايمنعك قضاء قضية بالامس فراجعت فيه نفسك ان

ترجع فی الحق - الفہم الفہم فیما یختلج فی صدرک مما لم یبلغک فی الکتاب والسنة واعرف الامثال و الاشباہ ثم قس الامور عندذلک واجعل لمن بینة امراً ینتھی الیہ فان احضر بینة اخذت لہ بحقہ والا وجہت القضاء علیہ والمسلمون عدول بعضہم علی بعض الا مجلوداً فی حد فی شہادة اومجرماً ظنینا فی ولاء او وراثة

রাজর্ষি হজরত ওমর ফারুকের এই চিরস্মরণীয় ফরমানকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, বিচার-নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম সমূহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে,—

(১) বিচারককে সমদর্শী হইয়া ন্যায় বিচার করিতে হইবে।

(২) অপরাধী সাব্যস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি ও অভিযোগ-কারী উভয়ই আইনের নজরে সমান।

(৩) প্রমাণের ভার সাধারণতঃ বিচার-প্রার্থীর উপর।

(৪) বিবাদী আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিবে।

(৫) অভিযোগ অস্বীকার করিয়াও বিবাদী আত্মপক্ষ সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিলে তাহার শপথ গৃহীত হইবে।

(৬) প্রমাণ উপস্থিত করিবার জন্য দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে।

(৭) নির্দ্দিষ্ট তারিখে বিবাদী অনুপস্থিত থাকিলে, মোকদ্দমা এক তর্ফা বিচার করিতে হইবে।

(৮) আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাদী বিবাদী মোকদ্দমার আপোষ-মীমাংসা করিতে পারিবে।

(৯) কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, বিচারক তাহার পুনর্ব্বিবেচনা করিবেন।

(১০) প্রত্যেক সাক্ষীকে সাধারণ ভাবে বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, যাবৎ মিথ্যুক প্রমাণিত না হয়।

বিচার নিয়ন্ত্রণের সূত্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিচার্য্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য হজরত ওমর ফারুক ঘোষণা করিলেন,—"আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র বাণী কোরআনমজিদ অনুসারে বিচার-মীমাংসা করিতে হইবে। কোরআন মজিদের সহায়তা না পাইলে হাদিছ অনুযায়ী, হাদিছ শরিফেও বিচার্য্য বিষয়ের মীমাংসা না থাকিলে, এজ্‌মা'র * আশ্রয় লইতে হইবে। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে আপন জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তা দ্বারা বিচার নিষ্পন্ন করিতে হইবে।" (১) হজরত ফারুক শুধু ফরমান লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। জটিল সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া বরাবর কাজীদিগকে পাঠাইতেন। সাক্ষ্য গ্রহণ সম্বন্ধে বহুবিধ নিয়ম প্রণালী গঠন করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থাপত্র বা বিরাট আইন-গ্রন্থের হুবহু নকল বিভিন্ন ইতিহাস-পুস্তকে এখনও লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

আইনের বিধান যতই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষী হউক না কেন, উহার ব্যবহার দোষে বিচার-বিভ্রাট অনিবার্য্য। ন্যায়বান ও সূক্ষ্মদর্শী বিচারক না হইলে সুন্দর আইনের বিদ্যমানতায়ও অবিচার ঘটে। আইনের অপব্যবহার দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জ কি ভাবে সুবিচার হইতে বঞ্চিত থাকে, বৃটিশ ভারতে বোধ হয়, ইহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। বিচারকের হাতে আইনের অপব্যবহার যাহাতে না ঘটিতে পারে, তজ্জন্য হজরত ফারুক নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজ্ঞদিগকেও নিয়োগ-কালে তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন।

অসঙ্গত উপায়ে যাহাতে কাজীগণ অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে না পারেন,

---

(১) كنز العمال * সর্ব্বসম্মতিক্রমে বা মতাধিক্যের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত।

ফারুকে আ'জম তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন এবং নিয়োগ কালে তিনি এই সাবধানতা অবলম্বন করিতেন যে, সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিসম্পন্ন আইনজ্ঞ ব্যতীত অপরকে কাজী মনোনীত করিতেন না। নির্দ্দিষ্ট বেতন ব্যতীত অন্যবিধ অর্থোপার্জ্জনের কার্য্য কাজীদিগের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীর প্রতি যদি আইন ও বিচারকের সমদৃষ্টির অভাব হয়, বিচার-বিভ্রাট অপরিহার্য্য। পবিত্র: ধর্ম্মাধিকরণে রাজাপ্রজা ধনীদরিদ্র, ভদ্রঅভদ্র ও শিক্ষিতঅশিক্ষিত সকলের সমান অধিকার না থাকিলে, সুবিচার দুর্ল্লভ হয়। আদালতের সীমায় যাহাতে পক্ষপাতিত্ব প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য মহাপ্রাণ হজরত ফারুক কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত ঘটনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

একদা হজরত ফারুকের সহিত উবাই বিন্ কা'বের মনোমালিন্য ঘটে। উবাই দারুল-খেলাফৎ মদিনার কাজী জায়দ বিন্ ছাবেতের আদালতে হজরত ওমর ফারুকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। ধার্য্য দিনে স্বয়ং আমিরুল মো'মেনীন অভিযুক্ত হইয়া কাজীর অদালতে উপস্থিত হইলে, কাজী জায়দ দর্শন মাত্রই হৃদয়ের আবেগে তাঁহাকে আমিরুল মো'নৌনরূপে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু অমিরুল মো'মেনীন তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন,—" পবিত্র ধর্ম্মাধিকরণে এরূপ অসমদর্শী ব্যবহার একেবারে অশোভন। ইহাতে বিপক্ষের প্রতি অত্যাচার হয়। প্রথম অপরাধ বলিয়া আজ তোমাকে ক্ষমা করা গেল।" বলিতে বলিতে আমিরুল মো'মেনীন হজরত ওমর ফারুক উবাইর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। উবাই অভিযোগের কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিলেন না। হজরত ফারুক অপরাধ অস্বীকার করিলেন। অথচ তিনি ও আত্মপক্ষ সমর্থনে অন্য কোন প্রমাণ উপস্থিত করিলেন না। আইন অনুসারে অভিযুক্ত

অসামী খলিফা হজরত ফারুকের শপথ গ্রহণ আবশ্যক হইল। কাজী জায়দ কিন্তু এতদ্‌পরিবর্ত্তে উবাইকে অনুরোধ করিলেন,—"আমিরুল মো'মেনীনকে হলফের দায় হইতে অব্যাহতি দাও।" এতচ্ছ্রবণে হজরত ফারুক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। কাজী জায়দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"**এই ধর্ম্মাধিকরণে ওমর ও অপর সাধারণ লোককে যদি সমান চক্ষে না দর্শন করিতে পার, তবে তুমি কাজী পদের যোগ্য নও।** ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও।"

হজরত ওমর একদিকে যেমন সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি যত্নশীল ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই বিচার সুলভ করিবার পক্ষপতী ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। আধুনিক সভ্য গবর্ণমেণ্টের নিকট বিনামূল্যে বিচার লাভ হয় না। আমাদের দেশে আইনী ও বে-আইনী বিচার-মূল্য সংস্থান করিতে না পারিয়া দৈনন্দিন কত দুর্ব্বল প্রবলের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত দুর্ব্বল তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। পক্ষান্তরে কত প্রার্থী বিচার-মূল্য বহন করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, তাহারও শুমার নাই। কিন্তু এছলামী আদালতে বিচার লাভের জন্য কোন প্রকার মূল্য দিতে হয় না। বিচার সুলভের প্রতি হজরত ওমর ফারুকের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই জন্য তিনি বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে কখনও কুণ্ঠিত ছিলেন না। আবার কাজীদিগের প্রতি কড়া তাকিদ ছিল, তাঁহারা যেন প্রকাশ্য ও সর্ব্ব সাধারণের প্রবেশাধিকার স্থলে, ফরিয়াদীর এজহার গ্রহণ ও বিচার-মীমাংসা সামাধা করেন। বিচার গৃহের দ্বারে বিচিত্র বসনধারী প্রহরী ছিলনা। পক্ষান্তরে বিচারককে হজরত ফারুক উপদেশ দিতেন, প্রশান্ত বদনে ও মিষ্ট ভাষায় আসামী

ও ফরিয়াদীর সহিত আলাপ করিতে হইবে; যেন তাহারা ভীতিবিহ্বল না হয়।

ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, আইন কাহারও অপরাধের অজ্ঞতা স্বীকার করে না। অজ্ঞতার আপত্তি আইনে কখনও শ্রবণযোগ্য নহে। "অপরাধ জ্ঞানে করি নাই," বলিলে, আইন অপরাধীকে ক্ষমা করিতে রাজী নহে। অথচ এহেন অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রচারার্থ কোন আধুনিক গবর্ণমেণ্ট এযাবৎ কিছুই করেন নাই। কিন্তু এছলামী শাসনের প্রথম প্রবর্ত্তনের দিন হইতে আইনের ধারা উপধারাগুলি প্রকৃতিপুঞ্জের জ্ঞানগোচর করিবার উদ্দেশ্যে এক স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগের নাম এছলামী আইনের পারিভাষায় "এফ্‌তা।" হজরত ওমর ফারুকের খেলাফৎ কালে স্থানে স্থানে আইনজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিরাজ করিতেন। সর্ব্ব সাধারণকে আইনের মর্ম্ম-শিক্ষা দানই তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল। যাঁহারা এই ভাবে আইনের মর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহাদিগকে মুফ্‌তী বলা হয়।

আইন ও বিচার সম্বন্ধে হজরত ফারুক যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। অভিজ্ঞ পাঠক তুলনা করিয়া অনুধাবন করিলে দেখিবেন, বর্ত্তমান ইউরোপ ঋনদ গুরু হজরত ফারুকেরই উচ্ছিষ্টভোজী। তাঁহারই বিচার-নিয়ন্ত্রণ-প্রণালীর চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া আধুনিক ইউরোপ আজ এতদূর গর্ব্বিত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রোমানগণ বিচার-নিয়ন্ত্রণ ও আইন প্রণয়ণের কল্পনা করিলেও, তাঁহাহারা তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। কেননা তাঁহাদের সূত্রসমূহ একেবারে অকর্ম্মণ্য।

রোমক সূত্রাবলী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠকগণ তাহাতে দেখিতে পাইবেন, এই সকল সূত্রাবলীর দ্বারা বিচার-নিয়ন্ত্রণ করা চলে না।

রোমান সূত্রাবলী

(১) সমন পাইলে অপর পক্ষের সহিত আদালতে হাজির হইবে।

(২) আসামী অস্বীকার করিলে, সাক্ষ্য উপস্থিত কর, তাহা হইলে তাহাকে বল পূর্ব্বক হাজির করা হইবে।

(৩) আসামী পলায়নের চেষ্টা করিলে, তুমি তাহাকে ধরিতে পার।

(৪) অসামী বৃদ্ধ কিম্বা রোগী হইলে, তাহার যাতায়াতের বন্দোবস্ত কর। অন্যথায় তাহাকে জোর করিয়া হাজির করা যাইবে না।

(৫) আসামী জামিন দিতে পারিলে, তাহাকে ছাড়িয়া দাও।

(৬) বিত্তশালীর জামিন বিত্তশালী হইবে।

(৭) বিচারককে উভয় পক্ষের সম্মতি লইয়া বিচার করিতে হইবে।

(৮) প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বিচারক মোকদ্দমা শুনিবেন।

(৯) দ্বিপ্রহরের পরে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে হুকুম দিবেন।

(১০) সন্ধ্যার পরে বিচারালয় বন্ধ থাকিবে।

(১১) উভয় পক্ষে যদি সালিশী বিচার চাহে, তাহাদিগকে জামিনে ছাড়িয়া দিবে।

(১২) সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে না পারিলে, বিবাদীর দরজায় গিয়া উচ্চৈঃস্বরে নিজের দাবী উপস্থিত করিবে।

স্বাধীনতা



সত্যই মানুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা স্বাবলম্বী হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতে পারে না—অন্ততঃ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে সভ্য ও সামাজিক জীব হইয়া সে কখনও বাঁচিতে পারে না। কেননা সমাজ ও সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে প্রকৃতির বিধানে তাহার আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই, হিংস্র পশুর সহিত সংগ্রাম করিয়া যাহারা বনে জঙ্গলে বাস করে, তাহাদেরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘ আছে। আবার শরীর ধারণ, লজ্জা নিবারণ ও শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতি প্রাকৃতিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্যও তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। তাই শক্তি ও সামর্থ্যানুসারে মানুষের সামাজিক জীবনের কর্ত্তব্যগুলিকে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লইতে হয়। এই কর্ম্ম বিভাগের জন্য কেহ কাহারও নিকট হেয় হইতে পারে না। এই কর্ম্মবিভাগকে পারস্পরিক সহায়তা বলে। কিন্তু কোন কোন স্বল্পবুদ্ধি মানুষ স্বার্থপরবশ হইয়া অপর মানুষকে দাস করিয়া ফেলে। আবার কেহ কেহ কল্পিত সুখের মিথ্যা আশায় পরবশতায় মজিয়া পড়ে—মানবের স্বাভাবিক সত্তা হারাইয়া ফেলে।

স্মরণাতীত কাল হইতে এই প্রভুত্ব ও দাসত্বের সংঘর্ষে মানবজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে চলিলে এছলাম আসিয়া ঘোষণা করিল, শ্বেতকৃষ্ণ বা নীলপীত বর্ণ বৈষম্যের দ্বারা অথবা ধনিক-শ্রমিক বা রাজা-প্রজা

বলিয়া ছোট বড় হইতে পারে না ; বরং মানুষে মানুষে সমান। কোরআন মজিদের এই দর্শন ব্যাখ্যা করিতে হইলে, স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। অতএব আমরা এই প্রবন্ধে স্বাধীনতা সম্বন্ধে হজরত ফারুকের উপদেশাবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনেক মনীষী মহাপুরুষ অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু হজরত ফারুকে আ'জমের ন্যায়

وقد ولدتهم امهاتهم احراراً

"মানুষ জন্মগত স্বাধীন—স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার," বলিয়া এমন স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত ভাষায় তাঁহারা বলিতে পারেন নাই। হজরত ফারুক শুধু বাক্যে প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। একটী নমুনা উদ্ধৃত করিলেই পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন, ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি কতদূর যত্নবান ছিলেন।

মিছর বিজয়ী বীর হজরত আমর বিন্ আ'ছের পরিচয় পাঠকগণ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। সেই আমর যখন মিছরের প্রতাপশালী শাসনকর্ত্তা, তখন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মিছরের আদিম অধিবাসী জনৈক কবতীকে অকারণে রাগভরে এক চপেটাঘাত করেন। হজরত ফারুক এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার যথোচিত শাস্তি বিধান করিলেন এবং বিরাট জনসঙ্ঘের সম্মুখে পিতাপুত্রকে সাম্বোধন করিয়া বলিলেন,

مذكم تعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً

"তোমরা কখন হইতে মানুষকে দাস করিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছ, অথচ

তাহারাত মাতৃগর্ভ হইতে স্বাধীন হইয়া জন্মলাভ করিয়াছে।” (১)

ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত ঐতিহাসিক সত্য যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আরবদিগের নিকট স্বাধীনতার প্রকৃত মর্য্যাদা-জ্ঞান ছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক আচার-প্রথার চাপে তাহাদের মধ্যেও নানা প্রকার অন্যায় খোশামদ বরামদের সৃষ্টি হইয়াছিল। কথায় কথায় বড়লোকদিগকে "বাপের বদলে বাপ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সম্মান বা খোশামদ জ্ঞাপনের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। ইহাতে হেয়তার গন্ধ আছে বলিয়া হজরত ফারুক এরূপ বাক্য ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করিতেন। কেহ তাঁহাকে এরূপভাবে সম্বোধন করিলে, তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেন।

একদা এক ব্যক্তি হজরত ফারুককে সম্বোধন করিয়া প্রাচীন প্রথানুসারে বলিল, جعلني الله فداك "আমি তোমার জন্য উৎসর্গীকৃত"। শ্রবণ মাত্র মহাপ্রাণ ফারুক—"কেন তুমি নিজকে হেয় করিতেছ" বলিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করেন। এই ভাবে খলিফার আপ্রাণ প্রচারের ফলে, তখন মোছলেমদিগের মধ্যে সাম্য ও স্বাধীনতার সৌম্য মূর্ত্তির কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল, নিম্ন বর্ণিত ঘটনাতেই তাহা অনুমেয়।

খলিফা হজরত ফারুকের ইচ্ছা জন্মিল, মোছলমানের সাম্য প্রীতি, স্বাধীন স্পৃহা ও সৎসাহসের পরীক্ষা করিবেন। তাই একদা তিনি মিম্বরে দাঁড়াইয়া খোৎবা দান কালে বলিয়া উঠিলেন "যদি আমি পার্থিব মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যাই, তবে তোমরা তাহার কি প্রতিবিধান করিবে?" অবিলম্বে এক জন অজ্ঞাতনামা শ্রোতা তরবারী হস্তে দণ্ডায়মান

---

(১) كنز العمال

হইয়া বলিল,—"তোমার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিব।" ফারুকে আ'জম আরও পরীক্ষা করিবার জন্য পুনরায় বলিয়া উঠিলেন,—"কি দুঃসাহস, আমার সম্বন্ধে এমন তীব্র কটূক্তি!" সেই অজ্ঞাত নামা শ্রোতা আবার বলিয়া উঠিল,—"হাঁ, তোমারই সম্বন্ধে।"

অতঃপর হজরত ফারুক বলিলেন, আলহাম্‌দু লিল্লাহ্! অতি সুখের বিষয়, আমি বিপথগামী হইলে, সুপথে ফিরাইয়া আনিবার লোকাভাব আমার জাতিতে হইবে না।"

আমাদের দেশে জাতীয় স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক মুক্তির চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখি না যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সমষ্টির নামই জাতীয় মুক্তি। যত দিন দেশের ধনিক জমিদার, ও পুরোহিতের অন্যায় প্রভুত্ব হইতে দেশ মুক্ত হইবে না, ততদিন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিয়া পররাষ্ট্রের বন্ধন মোচন অসম্ভব না হইলেও, সহজ সাধ্য নহে। আর যদি স্বাধীনতা লাভ হয়, সেই স্বাধীনতার মূল্যই বা কত!

দাস-প্রথা নিবারণ



বিশ্বময় প্রচার করা হইয়া থাকে, দাস-প্রথা নিবারণ ইংরেজ জাতির সর্ব্বাপেক্ষা বড় গৌরবের নিদর্শন। অথচ বাস্তবপক্ষে এই গৌরব মহাপ্রাণ খলিফা হজরত ওমর ফারুক তথা মোছলেম জাতিরই প্রাপ্য। এছলামের কৃতী সন্তান হজরত ফারুক এই দাস-প্রথা নিবারণ কল্পে যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাউক।

হজরত ফারুক খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আরবের বিভিন্ন অমোছলেম কবিলার যুদ্ধ-বন্দী দাসদিগকে মুক্ত করিয়া দেন। তিনি ঘোষণা করিলেন لايسترق عربي **আরবের লোক কাহারও দাস হইতে পারিবে না।** আরব ব্যতীত অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে এরূপ কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম তিনি করিতে পারেন নাই সত্য; কিন্তু ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, অ-আরবদিগের জন্য তিনি এই প্রথা বহাল রাখিয়াছিলেন। বরং ইহার রহস্য এই যে, আরবে বহির-আরবের যে সকল যুদ্ধ-বন্দী ছিল, তাহাদিগকে হঠাৎ মুক্ত করিয়া দিলেও স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার মত সুযোগ অনেকের ছিল না। পক্ষান্তরে হজরত ফারুককে ভীষণ-তর সংঘর্ষের সম্মুখীন হইতে হইত। সম্ভবতঃ তাই ফারুকে আ'জম দাস-প্রথার মুলোচ্ছেদ সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, সাক্ষাত যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কোন লোককে গোলাম করা যাইতে পরিবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃত হইলেও কৃষক ও শিল্পীকে দাসে

পরিণত করা বে-আইনী সাব্যস্ত হইবে। (১) ফলে বংশানুক্রমিক দাস ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর লোককে দাস করার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। অতঃপর তিনি বাধ্যতামূলক মোকাতবার (مكاتبة) প্রবর্ত্তন করেন। মোকাতবার অর্থ এই যে, কোন দাস আপন মূল্য অন্য কথায় নির্দ্দিষ্ট অর্থ দিয়া নিজের মুক্তি অর্জ্জন করিতে চাহিলে, মনিব তাহাকে মুক্ত করিয়া দিতে বাধ্য হইবে (১) এতদ্ব্যতীত বহু বিধি গঠন করলেন, যাহাতে গোলাম ও মনিবের অথবা দাসত্ব ও প্রভুত্বের ঘৃণ্য প্রভেদ ঘুচিয়া যায়। রাজকার্য্যে দাস ও প্রভুর সমান প্রবেশাধিকার ছিল। দাস বা মনিব বলিয়া বেতন নির্দ্ধারণে কোন পার্থক্য ছিল না।

দাসত্বের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ও নির্ম্মম চিত্র আত্মীয়-বিচ্ছেদ। হজরত ফারুক ইহা একেবারে রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। কোন মনিব ইহার ব্যতিক্রম করিয়া সন্তান হইতে মাতা পিতার অথবা ভ্রাতার নিকট হইতে ভ্রাতার বিচ্ছেদ ঘটাইলে তাহার উচিত প্রতীকারের ব্যবস্থা হইত।

হজরত ফারুক ঘোষণা করিলেন,

لا يفرق بين اخوين اذا بيعا

ভ্রাতার নিকট হইতে ভ্রাতাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারিবে না।

لا تفرقوا بين الام وولدها

দাসী মাতার নিকট হইতে তাহার সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিও না। (১)

---

(১) كنز العمال

দাসের আর একটি অসহ্য দুঃখ সামাজিক ব্যাপারে তাহার প্রতি ঘৃণ্য ব্যবহার। গোলামগণ যাহাতে সমাজে সমান ও সম্মানজনক ব্যবহার লাভ করিতে পারে, মহাপ্রাণ ফারুক তৎপ্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি খানা-জেয়াফতে পদস্থ ব্যক্তিগণ সহ গোলামদিগকে লইয়া এক সঙ্গে পানাহার করিতেন। একদা পানাহারের সময়ে উপস্থিত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—**"তাহাদের উপর অভিশাপ হউক, যাহারা দাসদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিতে লজ্জা বোধ করে।"** শাসনকর্ত্তাগণের উপর কঠোর আদেশ ছিল, যেন তাঁহারা দাসদিগের প্রতি সমান ও সদয় ব্যবহারে ত্রুটি না করেন এবং দাসগণ যাহাতে সর্ব্বত্র সমান ও সদয় ব্যবহার লাভ করিতে পারে, তৎপ্রতি যেন তাঁহারা দৃষ্টি রাখেন।

সেনাপতিদিগের নামে এক ফরমানে হজরত ফারুক লিখিয়া দিয়াছিলেন,

ان عبد المسلمين من المسلمين ذمتہ من ذمتہم يجوزامانہ

"মোছলমানের দাসও (মোছলমান হউক বা অমোছলমান হউক) মোছলমানের সমান; তাহার দায়িত্বও মোছলমানদিগের। সুতারং সে যদি আমান দান বা সন্ধি করে তবে উহা মোছলমানদিগের পালনীয় হইবে।" (১)

শাম জয়ের পর তথাকার খৃষ্টান যুদ্ধ বন্দীদিগকে বিনা শর্ত্তে মুক্তি

---

(১) كتاب الخراج

দেওয়া হয়। শিরাজ, ছামেগান প্রভৃতি দেশ অধিকারের পর খলিফা হজরত ওমর ফারুক ফরমান লিখিয়া পাঠাইলেন,—"কোন লোককে দাস করা হইবে না"। এতদ্ব্যতীত মিছর বিজয়ের পর যে সকল বন্দী আরবে অনীত হইয়াছিল, হজরত ফারুক আরবের বিভিন্ন স্থান হইতে তাহাদিগকে সমবেত করিয়া মুক্তি দান করেন। তদনুসারে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

একদা গোলাম ছায়রীন মনিব আনছের নিকট মোকাতবা-মুক্তির প্রার্থনা করেন; কিন্তু আনছ নির্ম্মমভাবে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই অভিযোগ খলিফার দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি অবিলম্বে আনছের প্রতি শাস্তি বিধান পূর্ব্বক ছায়রীনের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। (১)

হজরত ফারুকের এই উদার ব্যবস্থার ফলে দাসদিগের মধ্য হইতে বহু জ্ঞানী ও মনিষীর উদ্ভব হইয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একরামা ও নাফে' প্রমুখ হাদিছ-শাস্ত্রের এমামগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাফে' এমাম মালেক ছাহেবের ওস্তাদ ছিলেন।

প্রিয় পাঠক পাঠিকে! এইক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করুন, দাস প্রথা নিবারণের গৌরব হজরত ফারুকের কিম্বা ইংরেজ জাতির।

(১) بخاری

জিম্মীর অধিকার



ذمة "জিম্মা" শব্দের অর্থ দায়িত্ব। ধনপ্রাণের নিরাপদতা ও ধর্ম্ম স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোছলেম শাসন দায়ী বলিয়া এছলামী কানুনের পরিভাষায় অমোছলেম প্রজাকে ذمی "জিম্মী" বা "আহ্‌লে জিম্মা" اهل ذمة বলা হয়।

এছলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রোমক পারশিক প্রভৃতি পৃথিবীর কোন শাসন-শক্তি শাসিত প্রজাকে ধর্ম্মস্বাধীনতা দান করে নাই। অহিংস বৌদ্ধ রাজগণ প্রজার ধর্ম্ম-স্বাধীনতা হরণে ভারত ভূমিকে রক্ত রঞ্জিত করিতেও কসুর করেন নাই। বলিতে কি এছলামই সর্ব্বপ্রথমে জগতে ধর্ম্মস্বাধীনতা ঘোষণা করে।

لا اكراه فى الدين

"ধর্ম্ম বিশ্বাসে জোর জবরদস্তি নাই" একমাত্র কোরআন মজিদ ব্যতীত দুনিয়ার অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ এরূপ বিধান দান করে নাই।

শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ বা শাসিতের অধিকারের মধ্যে (১) ভূমির স্বত্ব (২) শাসন নীতি পরিচালনে বা রাজকার্য্যে অংশ গ্রহণ (৩) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা ধন প্রাণের নিরাপদতা (৪) ধর্ম্মস্বাধীনতা ও (৫) আচার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য রক্ষার্থ প্রধান। হজরত ফারুকে আ'জমের আমলে ধর্ম্মবিশ্বাসের বিভিন্নতা সত্ত্বেও জীম্মীগণ কি কি অধিকার ভোগ

করিয়াছিল, অতি সঙ্ক্ষেপে আমরা তাহার আলোচনা করিব। আমিরুল মো'মেনীন হজরত ফারুক ইলিয়াবাসী এহুদী ও খৃষ্টান প্রজাদিগকে নিম্নলিখিত চুক্তিপত্র দান করিয়াছিলেন,—

هذا ما اعطے عبد الله عمر امير المؤ منين اهل ايليا من الامان اعطا هم امانا لانفسهم و اموالهم و كنايسهم و صلبانهم و سقيمهم و بريها و ساير ملتها انه لا يسكن كنايسهم ولا تهدم ولا ينقض منها و لا من خيرها و لا من صلبهم و لا من شئى من اموالهم و لا يكرهون على دينهم و لا يضار احد منهم و لا يسكن با يلياء معهم احد من اليهود و على اهل ايليا ان يعطوا الجزية كما يعطى اهل المداين و عليهم ان يخرج منها الروم واللصوت فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وما له حتى يبلغوا ما منهم و من اقام منهم فهو آمن و عليه مثل اهل ايلياء من الجزية و من احب من اهل ايليا ان يمر بنفسه و ما له مع الروم وغلى بيعهم و صلبهم حتى يبلغوا ما منهم و على بيعهم و صلبهم حتى يبلغوا ما منهم و على بيعهم و صلبهم حتى يبلغوا ما منهم و على ما فى هذا الكتاب عهد الله و ذمة رسوله و ذمة الخلفاء و ذمة المؤ منين اذا اعطوا الذى عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بن وليد و عمرو بن العاص و عبد الرحمن بن عوف و معاوية بن ابى سفيان و كتب و حضر سنه ١٥

অনুবাদঃ—

এই আমান আল্লাহ তাআ'লার দাস আমিরুল মো'মেনীন ওমর ইলিয়াবাসীকে দান করিল। এই আমান তাহাদের ধন প্রাণ, গির্জ্জা ক্রুশ, সুস্থ

অসুস্থ, এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য। অতএব তাহাদের মন্দির গির্জ্জাকে বাসস্থান করা যাইবে না। (মোছলমানগণ উহা ব্যবহার করিবে না।) ঐ সকল গির্জ্জা ধ্বংস করা হইবেনা। গির্জ্জা সংলগ্ন স্থানের ক্ষতি সাধন করা হইবে না। তাহাদের ক্রুশ বা ধন সম্পত্তির কোন অনিষ্ট সাধন করা হইবে না। তাহাদের ধর্ম্মে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। এহুদীগণ তাহাদের সঙ্গে থাকিতে পারিবে না। অন্যান্য শহরবাসীর ন্যায় ইলিয়াসীরাও জিজিয়া দিবে। তাহারা রোমকদিগকে আশ্রয় দিতে পারিবে না। যে সকল রোমক ইলিয়া ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিবে, স্বদেশে গিয়া না পঁহুছা পর্য্যন্ত তাহাদের ধন প্রাণের নিরাপদতার জন্য আমরা দায়ী। যাহারা ইলিয়ায় বাস করিতে ইচ্ছুক, তাহদিগকে আমান দেওয়া হইবে। অবশ্য তাহাদিগকে জিজিয়া দিতে হইবে। ইলিয়াবাসীদের মধ্য হইতে যদি কেহ বা কাহারা আপন ধন সম্পত্তি লইয়া রোমকদিগের সঙ্গে চলিয়া যাইতে চাহে, সে বা তাহারা অনায়াসে যাইতে পারে। তাহাদের গির্জ্জা ও ক্রুশ নিরাপদ থাকিবে। এই পত্রে যাহা লিখিত হইল, তজ্জন্য আল্লাহ্, আল্লাহ্ তাআলার রছুল, তাঁহার খলিফাগণ ও সমস্ত মোছলমমানই দায়ী থাকিবেন, যদি ইলিয়াবাসী জিজিয়া দান করে। খালেদবিন্ অলীদ, আমর বিন্ আ'ছ, আবদুর রহমান বিন্ আউফ ও মআবিয়া বিন্ আবি ছুফিয়ান ইহার সাক্ষী রহিলেন এবং হিজরী ১৫শ সালে ইহা লিখিত ও সম্পাদিত হইল। (১)

জর্জ্জিয়া বিজয়ের পর হজরত ফারুক যে ফরমান প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে লিপিবদ্ধ ছিল,—

---

(১) طبری

لهم الامان على انفسهم واموالهم وملتهم وشرايعهم ولايغير من شئى من ذلك

"তাহাদের (বিজিত প্রজাবৃন্দের) জানমাল, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র নিরাপদ থাকিবে। তাহার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইবে না (১)

আজর-বায়জান বিজয়ের পর হজরত ফারুক ফরমানে লিখিয়া দিয়াছিলেন,—

الامان على اموالهم وانفسهم وملتهم وشرا يعهم

ধন প্রাণ ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম বিধান নিরাপদ থাকিবে। (১)

মুকান বিজয়ের পর আর এক ফরমানে লিখিত হইয়াছিল,

الامان على اموا لهم وانفسهم و ملتهم وشرا يعهم

এরূপ আরও বহু ফরমান বা চুক্তিপত্র বিভিন্ন ইতিহাস-পুস্তকে বিদ্যমান রহিয়াছে। অনুসন্ধিৎসুগণ তৎসমুদয় দেখিয়া লইতে পারেন। স্মরণ রাখিবেন, এই সকল চুক্তি আধুনিক গবর্ণমেণ্টের ম্যাগ্না চার্টার ন্যায় ছিন্ন পত্ররূপে ব্যবহৃত হইত না।

ইলিয়ার এই চুক্তিপত্রের প্রাথমিক ইতিহাস বায়তুল "মোকদ্দছ বিজয়ের" সহিত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। বিজ্ঞ পাঠকগণ এই চুক্তির শর্ত্তগুলি বিশ্লেষণ পূর্ব্বক শাসিতের পূর্ব্বোল্লোথিত পঞ্চ অধিকারের সন্ধান করুন।

ভূমির প্রতি প্রজার অধিকার ও শাসন ব্যাপারে তাহাদের অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে যথাস্থানে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রোয়োজন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া

(১) كتاب الخراج

আসিয়াছি। বলিতে কি এছলামী কানুনের নজরে আরব অ-আরব বা মোছলমান অমোছলমানের কোন পার্থক্য ছিল না। বকর্-বিন্-ওয়ায়েল কবিলার কোন আরব মোছলেম হিরার জনৈক খৃষ্টানকে হত্যা করে। ফারুকে আ'জমের বিচারে সেই আরব মোছলমানকে নিহত খৃষ্টানের উত্তরাধিকারী হোনায়নের নিকট সমর্পণ করা হয়। হোনায়ন আত্মীয়ের জীবনের বিনিময়ে সেই হত্যাকারী আরবকে প্রাণে বধ করে।

বৃটিশ শাসনের উদারতার নিদর্শন স্বরূপ ধর্ম্মস্বাধীনতা (Non-in -terference in Religion) এর ডঙ্কা পিটান হইয়া থাকে। বাস্তবপক্ষে উহা ধর্ম্ম স্বাধীনতা নহে—বরং উহাকে ধর্ম্ম-স্বেচ্ছাচার বলা যাইতে পারে। প্রজা ধর্ম্মগত কর্ত্তব্য পালন করিতেছে কি না, সেই সম্বন্ধে বৃটিশ শাসন উদাসীন। হজরত ফারুক একদিকে যেমন প্রজার ধর্ম্ম স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, অন্যদিকে অ-মোছলেম প্রজাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে শাসন করিবার সুযোগ ও অধিকার দান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার ঘটিত বিষয় সমূহের বিচারের জন্য তাহাদের স্বতন্ত্র আদালৎ ছিল। একান্ত সাধারণ শাসন ও শৃঙ্খলা বিধানের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত না হইলে, মোছলেম কাজীর আদালতে তাহাদের বিচার হইত না। বরং স্ব স্ব ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আদালতেই বিচার মীমাংসা নিষ্পন্ন হইত।

ফলকথা হজরত ফারুকের শাসনে জিম্মীগণ যে সকল অধিকার অবাধে ভোগ করিয়াছে, তাহার তুলনা জগতের কোন অতীত বা বর্ত্তমান অমোছলেম শাসনতন্ত্রে নাই। এরূপ অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ কোন প্রজা পায় নাই ও পায় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই পাঠক তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

জিজিয়া কর আদায়ে যাহাতে জিম্মীগণের প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন

না হইতে পারে, তজ্জন্য ফারুকে আ'জম শাসনকর্ত্তাদিগকে সাবধান করিয়া বলিতেন,—

لاتعذبون الناس فان الذين يعذبون الناس فى الدنيا
يعذبهم الله يوم القيامة

"মানুষকে (জিজিয়া আদায় ব্যাপারে) কষ্ট দিওনা। যাহারা মানুষকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয়, আল্লাহতাআলা কেয়ামতে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।" (১)

শামদেশ বিজয়ের পর ফারুকে আ'জম হজরত আবু ওবায়দার নামে ফরমান লিখিয়াছিলেন,—

وامنع المسلمين من ظلمهم والاضراربهم واكل اموالهم الا
يحلها ووف بهم بشرطهم الذى شرطت لهم فى جميع اعطتيتهم

অর্থাৎ মোছলমানদিগকে সাবধান করিয়া দাও, তাহারা যেন বিজিত-দিগের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন না করে অথবা যেন তাহাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ না করে। তাহাদের সহিত যে চুক্তি হইয়াছে, তাহার সমস্ত শর্ত্ত পূর্ণ করিবে। (১)

দীন দুর্ব্বল প্রজা উপার্জ্জনে অক্ষম হইলে, তাহাদের জন্য সরকারী বৃত্তি নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা এছলামী শাসনে ফারুকী আমলের পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। ইহাতে মোছলমান অমোছলমানের কোন প্রভেদ ছিল না। এই অজিফা সম্বন্ধে হজরত ফারুক ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

وجعلت لهم ايما شيخ ضعف عن العمل او اصابه آفة من
الافات او كان غنيا فافتقر فصار اهل دينة يتصدقوا عليه طرحت

(১) ازالة الخفا

جزئية وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما اقام بدار الهجرة ودار الاسلام - فان خرجوا الى غيردار الهجرة ودار الاسلام فليس على المسلمين النفقة على عياله

অর্থাৎ কোন জিম্মী যদি বার্দ্ধক্য হেতু শ্রমে অক্ষম হয় অথবা নৈসর্গিক আপদ বিপদের দ্বারা সঙ্গতিহীন হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে জিজিয়া হইতে মুক্তি দিয়া তাহার ও তাহার পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণের নিমিত্ত বায়তুলমাল হইতে অজিফা নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু মোছলেম রাজ্য ত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া গেলে তাহার অজিফা মওকুফ হইয়া যাইবে। (১)

এহুদী খৃষ্টানদিগের "নাকুছ"বা ঘণ্টাধ্বনি সম্বন্ধে হজরত ফারুক ব্যবস্থা দিয়াছিলেন,—

يضربون نوا قيسهم فى اى ساعة شاؤا من ليل او نهار الا فى اوقات الصلوة

অর্থাৎ নমাজের সময় ব্যতীত রাতদিনের মধ্যে যখন ইচ্ছা জিম্মীগণ ঘণ্টাধ্বনি করিতে পারিবে। বিশ্ববরেণ্য পুরুষ মহাপ্রাণ ফারুক জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে শাহাদতের অন্তিম শয্যায়ও জিম্মী প্রজাকে ভুলিতে পারেন নাই। ভাবী খলিফাকে লক্ষ্য করিয়া শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে অন্তিম উপদেশে বলিতেছেন,—

واوصيه بذمة الله وذمة رسوله ان يوفى لهم بعهدهم و ان يقاتل من ورائهم و ان لا يكلفوا فوق طاقتهم

আল্লাহ ও আল্লাহ তাআলার রছুলের "জিম্মা" সম্বন্ধে আমার অছিয়ৎ, তাহাদের

সহিত যে সকল চুক্তি হইয়াছে, তৎসমুদয় যেন প্রতিপালিত হয়। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাহাদের হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। তাহাদিগকে শক্তির অতীত কষ্ট দিও-না (কর ভারে নিপীড়িত করিও না।)

এইত গেল জিম্মীর অধিকার সম্বন্ধে হজরত ফারুকের স্বীয় কার্য্যাবলী। তাঁহার এই শিক্ষার ফলে এছলামী সাধারণ তন্ত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জিম্মীর অধিকারের প্রতি শাসক সম্প্রদায়ের মনোভাব কিরূপ ছিল, দুইটী উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

হামছের শাসনকর্ত্তা আমীর বিন্ ছা'দ কোন জিম্মী কর্ত্তৃক উত্যক্ত হইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, خزاك الله "আল্লাহ তোমাকে অপমানিত করুন।" এই অবিনীত ব্যবহারের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। (১)

গর্ফা একজন ভক্ত ছাহাবী। তাঁহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন খৃষ্টান বিশ্বের শান্তি ও মুক্তিদাতা মহানবী আকা মোস্তফাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ আরম্ভ করিল। ভক্ত ছাহাবীর পক্ষে একদম অসহ্য হইয়া উঠিলে তিনি সেই খৃষ্টানকে চপেটাঘাত করেন। অতঃপর কাপুরুষ খৃষ্টানটী হজরত আমর বিন্ আ'ছের দরবারে গিয়া সেই চপেটাঘাতের বিচার প্রার্থী হইল। দরবারে গর্ফার তলব হইল। হাজির হইয়া স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। বর্ণনা শুনিয়া হজরত আমর বলিলেন,—"তুমি কি জান না তাহাদিগকে আমান দেওয়া হইয়াছে।"

কোন কোন ইউরোপীয় খৃষ্টান ঐতিহাসিক এছলামী শাসন নীতির

সমালোচনা করিতে গিয়া "জিম্মী" শব্দে হেয়তার গন্ধ পাইয়াছেন। এই তথাকথিত "হেয়তার" প্রমাণরূপে তাঁহারা "জিজিয়া" ও "কিস্তিজকে" লইয়া আকাশ পাতাল আলোড়িত করিয়াছেন। জিজিয়ার যথার্থ স্বরূপ "রাজকর" অধ্যায়ে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল অর্ব্বাচীন লেখকের প্রতিবাদ কল্পে বোধ হয়, তাহাই যথেষ্ট হইবে। কিস্তিজ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

বিপক্ষ খৃষ্টান লেখকগণ বলিয়াছেন,—"ওমর হেয়তার পরিচায়করূপে জিম্মীদিগকে কোমরে কিস্তিজ ও মাথায় লম্বা টুপি পরিধানের আদেশ করিয়াছিলেন।" বুদ্ধিমান পাঠকগণ কথাটার দুইটী অংশকে স্বতন্ত্র ও পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লউন। প্রথমটি "হেয়তার পরিচায়ক" এবং দ্বিতীয়টী হইল, "কোমরে কিস্তিজ † ও মাথায় লম্বা টুপী পরিধান।" "কোমরে কিস্তিজ ধারণ বা মাথায় লম্বা টুপী পরিধান" কোন্ দেশে কোন্ কালে হেয়তার পরিচায়ক ছিল, তাহার প্রমাণের ভার লেখকগণের উপর। কিন্তু বহু সন্ধান করিয়াও, তাঁহাদের লেখায় তাহা পাই নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে কেহ খুঁজিয়া পাইবে বলিয়াও আমার বিশ্বাস হয় না। পক্ষান্তরে হজরত ফারুকের ভাষায়ও এমন কথার উল্লেখ নাই অথবা ঐ সকল লেখক এমন দাবীও করেন নাই। অতএব প্রথম অংশের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই; উহা ভিত্তিহীন এবং লেখকগণের কল্পনা প্রসূত। পক্ষান্তরে ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, হজরত ফারুকের আমলে তৎপূর্ব্বে বা পরে আরব ও মিছর দেশের কুত্রাপি অমোছলমান সম্প্রদায়ের এরূপ লেবাছ ছিল না। সুতরাং জিম্মী সাধারণের জন্য খলিফা ফারুক এরূপ কোন বিশেষ লেবাছের ব্যবস্থা করেন নাই, তাহাই প্রমাণিত হয়।

† পুরাকালে পারশ্য দেশে এক প্রকার পেটী কোমরে ধারণ করা হইত।

পূর্ব্বদিকে পারশ্যবাসীর লেবাছের প্রতি তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, মোছলেম বিজয়ের পূর্ব্বে ইহাই ছিল তাহাদের জাতীয় পরিচ্ছদ। এখনও পারশিকগণ সগৌরবে জাতীয় পরিচ্ছদরূপে উহার ব্যবহার করিয়া থাকে। ইতিহাসে আরও দেখা যায়, বগ্‌দাদে খলিফা মনছুরের সময়ে উহা দরবার পোষাকরূপে সমাদৃত হইয়াছিল। সুতরাং হেয়তার প্রশ্নটা একেবারে বাজে ও বাতেল।

কথা এই যে, পারস্যের পারশিক সম্প্রদায়,

ان تلزم ترينا حيث ماكنا

অর্থাৎ "আমরা আমাদের প্রাচীন বা জাতীয় পরিচ্ছদই ব্যবহার করিতে চাহি" বলিয়া হজরত ফারুকের খেদমতে আবেদন করিলে, তিনি তাহা মন্‌জুর করেন।

বৃটিশ ভারতে বোধ হয়, এই ব্যবস্থার সারবর্ত্তা বুঝাইবার জন্য বেগ পাইতে হইবে না। কৃশ ও কৃষ্ণকায় বাবুর হেট্‌-কোট-পরা-সঙ যখন রাজপথে বাহির হয়, তখন তাহাদিগকে এরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহারে নিরস্ত করিবার জন্য নিরপেক্ষ দর্শক মাত্রই বিশেষ বিধি প্রণয়নের আবশ্যকতা অনুভব করেন। পারশিক সমাজপতিগণও তাহাই করিয়াছিলেন। সমাজগত বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য এবম্বিধ বিধি প্রণয়নের প্রয়োজন আছে।

ফলতঃ হজরত ফারুকের শাসনে ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইত না। বরং তাহারা আপন আপন সম্প্রদায়িক সঙ্ঘের ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে বাধ্য হইত। ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রজা-পালন



দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনই রাজশক্তির কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রথমোক্ত কর্ত্তব্য আপেক্ষিক ও আনুসঙ্গিক মাত্র। সুতরাং তার প্রকৃত ও প্রধান কর্ত্তব্য প্রজা-পালন। স্বভাবের বিধানে মানুষের এমন বহু অভাব আছে, যাহার পূরণ তাহার ব্যক্তিগত শক্তির অতীত। এই সকল অভাব পূরণের জন্যই রাজশক্তির আবশ্যক। মানুষ যদি আপন শক্তি অনুসারে কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি করে অথবা এক মানুষ অপর মানুষের ক্ষতি সাধন করিতে উদ্যত হয়, তখন এবং তখনই মাত্র শাসনের আবশ্যক। অন্যথায় শাসনের প্রয়োজন নাই। দুনিয়াতে অদ্যাবধি সৎ ও শিষ্ট লোকই বেশী এবং ভবিষ্যতেও এরূপ সংখ্যাধিক্য থাকিবে, স্বীকার করিয়া লইয়াই রাজ-শক্তির কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে। প্রজার সুখে দুঃখে রাজাকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে হইবে। কিন্তু আজ ইউরোপের মৌলিক বিধানে রাজশক্তির নাম হইয়াছে—শাসন, দমন বা Government. ইউরোপ দুনিয়ার ইতিহাস ও স্বভাবগত সত্যের বিরুদ্ধে মানবজাতিকে দুষ্ট বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে। 'কিন্তু এছলামের নিকট তাহার অনুমোদিত রাজশক্তি আল্লাহ তাআলার নয়াবৎ। এছলামের ইতিহাসে এই নয়াবৎ খেলাফৎ ও এমারতের উভয় নামেই পরিচিত। হজরত আবুবকর ছিদ্দিকের উপাধি ছিল "খলিফা"। হজরত ফারুকে া'অজম খলিফা ও আমিরুল মো'মেনী উভয় উপাধিতে ভূষিত হন। উভয় উপাধিই একার্থ বাচক। এই উপাধিদ্বয়ে

প্রভুত্বের গন্ধ নাই, আছে শুধু সমবায়শক্তিতে প্রজা-পালন বা প্রজা পরিচালন।

পাঠকগণ বোধ হয়, রাজর্ষি হজরত ফারুকের পরিচালনাধীন বিশাল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ভুলিয়া যান নাই। আবার সেই বিশাল সাম্রাজ্যে কত দেশ, কত দল, কত জাতি ও কত ধর্ম্মবলম্বী! বিধ্বস্ত শক্তির পুনরুত্থান বা প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছা ইহার উপর স্বতন্ত্র। তথাপি সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব শান্তি ও সন্তোষে পরিপূর্ণ। এই শান্তি ও সন্তোষের মূলে মহাপ্রাণ হজরত ফারুকেরই কৃতিত্ব—তাঁহারই প্রজাপালন-নীতি। "জিম্মীর অধিকার" প্রসঙ্গে এই প্রজা-পালন-নীতি সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহার দ্বিরুক্তি করিব না। ফারুকী আমলের এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে চাহি, দুনিয়ার বড় বড় গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত যাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

রাজ্যের অনাহার-ক্লেশ নিবারণ প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্য। ভারতের বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও তাহা অস্বীকার করেন না। কিন্তু এই সুজলা সুফলা ভারত ভূমিতে অনাহার ক্লিষ্ট লোকের শুমার করে কে? এই অতুল ঐশ্বর্য্যশালী প্রাসাদকণ্টকিত নগরী কলিকাতার বুকে অহরহ কত নরনারী উপবাসের যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে, কে তাহাদের গণনা করে? আমাদের সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন সন্ধান করিয়াছেন অথবা এই ক্লিষ্টদিগের অন্ন সংস্থান করিয়া দিয়াছেন এমন কথা শুনিতে পাই নাই। কিন্তু হজরত ফারুক অনাহারক্লেশ নিবারণে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। বলিতে কি আমিরুল মো'মেনীন হজরত ফারুক উপবাস নিবারণ কল্পে যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

উপবাসের তিনটি কারণ হয়। কোন কোন লোক এতদূর অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে, স্বগৃহে থাকিয়াও অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিেত পারে না। বিদেশে বিপদগ্রস্ত হইয়া অতিথিকেও অনেক সময় অনাহার-ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এই শ্রেণীর উপবাস নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এতদ্ব্যতীত দুর্ভিক্ষের প্রপীড়নেও লোকের উপবাস অনিবার্য্য হয়। এই ত্রিবিধ কারণে রাজ্যের কুত্রাপি কোন লোককে যাহাতে উপবাস করিতে না হয়, তজ্জন্য ফারুকে আ'জম বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এই মর্ম্মে তিনি শাসনকর্ত্তাদিগের নামে ফরমানও জারি করিয়াছিলেন। শ্রমের অযোগ্য দীন দরিদ্রদিগের জন্য বায়তুল-মাল হইতে বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। তাহাতে ধর্ম্ম জাতি বা বর্ণের কোন ভেদাভেদ ছিল না। মোছাফেরদিগের জন্য স্থানে স্থানে মেহমান-খানা নির্ম্মিত ছিল। মদিনার লঙ্গর-খানায় তিনি স্বয়ং গিয়া অতিথিদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন। মাঝে মাঝে তিনি আহার্য্যও পরিবেশন করিতেন। হিজরী ১৮শ সালে আরবে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে প্রজার রক্ষা কল্পে তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থান সমূহের নক্সা আঁকাইয়া অধিবাসীর এক তালিকা প্রস্তুত করিলেন। কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগের খাদ্য সরবরাহের ভার আমিরুল মো'মেনীন স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। অপরাপর আহার্য্য ব্যতীত একা তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রত্যহ ১২০ এক শত বিশটি উষ্ট্র জবেহ হইত। এই ভাবে বায়তুলমালের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইলে পর প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাগণের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ সাহায্য পাঠাইতে লাগিলেন। কোন প্রদেশ হইতে শস্যাদি ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া পরিদর্শন করিতেন।

ফারুকী শাসনে পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকার ভরণ-পোষণ ও সম্পত্তি

সংরক্ষণের বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। নিরুদ্দিষ্ট বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত সরকারী জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং অভিভাবকের সন্ধানের নিমিত্ত বিহিত ব্যবস্থা করা হইত। হজরত ফারুকের প্রজাপালনের বৈশিষ্ট্য লিখিয়া শেষ করা যায় না। আমরা এই স্থলে কতিপয় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

শাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিপার্শ্বে একটি তাঁবু হজরত ফারুকের দৃষ্টি গোচর হইল। নিকটে উপস্থিত হইয়া তিনি তথায় এক বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওমরের কোন খবর রাখ কি?" প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধা বলিল, "শাম দেশ পরিদর্শন করিয়া সে মদিনা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। তার সর্ব্বনাশ হউক, সে এযাবৎকাল আমাকে কিছুই দান করে নাই।" মহামতি ফারুক বলিলেন, "এই দূর দেশের কথা তিনি অবগত হইবেন কি করিয়া?" বৃদ্ধা আবার বলিল,—"প্রজার অবস্থাই যদি অবগত হইতে না পারিল, খেলাফতে তাহার কাজ কি?"

আছলম বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা রাত্রিকালে হজরত ফারুক নগর পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। মদিনা হইতে তিন মাইল দূরে গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি স্ত্রীলোক রান্না করিতেছে আর তার পার্শ্বদেশে দুইটি শিশু ক্রন্দন করিতেছে। কান্না শুনিয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া তিনি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকটি বলিল,—"ছেলে দুইটি অনাহার ক্লেশে কাঁদিতেছে। তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আমি শূন্য হাঁড়ি চুলার উপর চড়াইয়াছি।" হজরত ফারুক তৎক্ষণাৎ মদিনায় ফিরিলেন। বায়তুল-মাল হইতে ঘি, আটা, এবং খেজুরের মোট বাঁধিয়া আছলমকে বলিলেন, **"আমার পিঠের উপর চাপিয়া দাও।"** আছলম সেই মোট বহনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মনস্বী হজরত ফারুক বলিলেন,—**"হাঁ, কিন্তু কেয়ামতের শেষ-বিচার-**

দিবসে তুমি আমার ভার বহন করিবে না।” ফল কথা হজরত ফারুক এই সকল খাদ্য দ্রব্য লইয়া স্ত্রীলোকটির নিকট গেলেন। তিনি স্বয়ং আগুণ জ্বালিয়া দিলেন। রান্না হইল, শিশুগণ পেট পূরিয়া আহার করিল, আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল আর মহাত্মা হজরত ফারুক তদ্দর্শনে নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলেন।

হজরত আবদুর রহমান বিন্ আউফ বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ওমর আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেও হইত। হজরত ফারুক বলিলেন,—“এই মাত্র শুনিলাম, নগরের অদূরে এক কাফেলা আসিয়া অবস্থান করিতেছে। চল, আজ রাত্রি আমরা দুই জনে মিলিয়া তাহাদিগকে পাহারা দেই।” সেমতে সারা রাত্রি জাগিয়া উভয় সেই কাফেলার পাহারা দিলেন।

আছলম হইতে বর্ণিত আছে,—আরবের দুর্ভিক্ষ কালে হজরত ফারুক নিরতিশয় চিন্তিত থাকিতেন। সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন,—“হে বিশ্বপালক প্রভু! তুমি আমার পাপের জন্য উম্মতের সর্ব্বনাশ করিও না। যত দিন দুর্ভিক্ষ ছিল ঘৃত মাংস প্রভৃতি কোন সুস্বাদু বস্তু তিনি আহার করেন নাই।”

একদা রাত্রিকালে গশ্‌ত করিতে করিতে হজরত ফারুক কোন যাযাবর বদ্দুর তাঁবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁবুর বহির্দ্দেশে একজন বদ্দু বসিয়া আছে দেখিয়া তাহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ তাঁবুর অভ্যন্তর হইতে কান্নার শব্দ শুনিতে পাইলেন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, সেই বদ্দুর স্ত্রী প্রসব-বেদনায় কষ্ট পাইতেছে। এতচ্ছ্রবণে ফারুকে আ'জম গৃহে ফিরিলেন। সহধর্ম্মিণী

বিবী উম্মে-কলছুম সমভিব্যহারে আবার সেই তাঁবুতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বদ্দুর অনুমতিক্রমে বিবী উম্মে-কলছুমকে তাহার স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে বিবী উম্মে-কলছুম বলিয়া উঠিলেন,—হে আমিরুল মো'মেনীন, আপনার বন্ধুকে মোবারকবাদ দিন। "আমিরুল মো'মেনীনের" নাম শুনিয়া বদ্দু চমকিয়া উঠিল। কিন্তু হজরত ফারুক বলিলেন,—"কিছুই মনে করিও না।"

তদ্‌বীর

—०:0:०—

ফারুকে আ'জমের শাসনপ্রণালী, বিচারপদ্ধতি ও প্রজাপালন-নীতি সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে পাঠক ভ্রাতৃগণ তাঁহার রাষ্ট্রবুদ্ধি ও নেতৃত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন। এস্থলে কয়েকটা বিশেষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাবর, নাদের, আল্‌ফ্রেড প্রভৃতি যথেষ্ট শক্তি ও অধ্যাবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এরূপ পরিচয় খুব বিরল। অনেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াও স্বেচ্ছাতন্ত্রের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বীর নেপোলিয়ানকেও এই লোভের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আবার সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা গণতন্ত্রের অধিপতি হন সাধারণতঃ কতিপয় জনপ্রতিনিধির হাতে পুতুলরূপে তাঁহারা প্রায়শঃ পরের ইচ্ছাই সাধন ও সম্পাদন করিয়া থাকেন। ফরাসী সাধারণতন্ত্রের পরবর্ত্তী সভাপতিগণই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। নানা প্রতিকূলাচরণ অতিক্রম করতঃ স্বমত ও গণমতে সমঞ্জস ঘটাইয়া যাঁহারা রাষ্ট্র পরিচালনায় সফলকাম হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমিরুল মো'মেনীন হজরত ওমর ফারুকের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম খলিফার অফাতের পর কিরূপ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্মুখে রাখিয়া ফারুকে আ'জম খেলাফতের গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠক মহোদয়গণ পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। একদিকে স্বয়ং আরবে

একদল মোছলমান তাঁহার বিরুদ্ধবাদী ছিল। তাহারা ফারুকে আ'জমকে খলিফা বা আমিরুল-মোমেনীন বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী ছিল না। তাহাদের মতে হাশেম বংশীয় না হইলে অপর কাহারও খলিফা হওয়ার অধিকার নাই। অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীরও অভাব ছিল না। কিন্তু যেই নম্রকঠোর কৌশলে হজরত ফারুক তাহাদিগকে শাসন ও বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। তিনি সসাহসে স্পষ্ট ভাষায় প্রতিদ্বন্দ্বিবর্গকে বলিতেছেন,

لو لا رجاي ان اكون خير كم لكم و اقوے كم عليكم وا شد كم
اضلاعاً بما ينوب من مهم امر كم ما توليت ذلك منكم -

*　　*　　*　　*

لو علمت ان احداً اقوے' على هذاالامر منى لكان ان
اقدم فيضرب عنقى اهون علىّ

"অর্থাৎ আমার বিশ্বাস, আমি তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য এবং শক্তিশালী। এই বিশ্বাস না থাকিলে, খেলাফতের গুরু ভার বহনে আমি কখনও স্বীকৃত হইতাম না। যদি আমার জ্ঞানে তোমাদের মধ্যে আমাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি থাকিত, তবে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণাপেক্ষা আমার কতলের ব্যবস্থাই শ্রেয় মনে করিতাম।"

ফলতঃ আধুনিক বীর সম্প্রদায়ের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর শিরশ্ছেদ বা দীপান্তর বাসের কোন ব্যবস্থা তিনি করেন নাই। দল সৃষ্টি করিয়া

আত্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজনে তিনি লিপ্ত হন নাই। বরং নম্রকঠোর ভাষায় ও প্রকাশ্য সভায় সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিবর্গ ফারুকে আ'জমের আত্মবিশ্বাস ও সত্যবাদিতার নিকট নত মস্তকে বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। এরূপ দাম্ভিকতাহীন আত্মবিশ্বাসেই মানুষের প্রকৃত শক্তি।

অন্যদিকে আরবের বাহিরে ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত। মিছর ও পারশ্য বিজয়ের পর ভূতপূর্ব্ব শাসক সম্প্রদায় রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের পথে পদে পদে বিষম অন্তরায় উপস্থিত করিতে ব্যস্ত হইল। বিশ্বাসের ব্যবধানে তাহাদের সহায়তা মিলিল। মোছলমানদিগের সহিত খৃষ্টান ও পারশিকদিগের সম্বন্ধ যেন বাঘ ও মহিষের। সদ্যবিজিত খৃষ্টান ও পারশিকগণ মোছলেমদিগকে পরম শত্রু জ্ঞান করিতে লাগিল। এছলাম ও মোছলেম জাতির সর্ব্বনাশ সাধনই অনেকে আপন আপন জীবনের ব্রত করিয়া লইল। প্রভুত্বপ্রিয় সমাজ ধর্ম্মের নামে তাহাদিগকে নানা প্রকারে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু ফারুকে আ'জমের অসাধারণ রাষ্ট্রকৌশল ও প্রজাপালন-নীতির ফলে অল্পকাল মধ্যেই সেই বাঘে মহিষে মিলিয়া এক ঘাটে জলপান করিতে আরম্ভ করিল। হজরত ফারুক কোরআন মজিদের নির্দ্দেশ মতে ধর্ম্ম স্বাধীনতা ঘোষণা পূর্ব্বক বিজিত রাজ্যে ভূমির প্রতি প্রজা ও মধ্য স্বত্বাধিকারীর অধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন। গত শাসনে যাঁহারা পদস্থ ছিলেন, তাঁহাদিগকে স্বপদে বহাল রাখিয়া দিলেন। যাঁহাদিগকে স্বপদে বহাল রাখা সম্ভব হইল না, তাঁহাদের জন্য যথোচিত বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। ফলে প্রভুত্বপ্রিয় সমাজ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়া গেল। রাজশক্তির পরিবর্ত্তনে জনসাধারণের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, ফারুকে আ'জমের ন্যায় বিচার ও সদয় ব্যবহারে সেই চাঞ্চল্যও দীর্ঘস্থায়ী হইল না। এমাম আবু ইউছুফ ছাহেব বলেন,—

فلما راى اهل الذمة وفاء المسلمين لهم و حسن السيرة فيهم صاروا اشداء على عدوالمسلمين و عونا للمسلمين على اعدائهم

অর্থাৎ "বিধর্ম্মী প্রজাগণ মোছলমানদিগের প্রতিজ্ঞা পালন ও চরিত্রবল দেখিয়া মোছলমানদিগের শত্রুর প্রতি কঠোর হইয়া গেল এবং মোছলমানদিগের সাহায্যে অগ্রসর হইল।" হজরত ফারুকের স্থায় ও নিরপেক্ষ বিচারের একটী দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পুত্র আবু-শাহ্‌মাকে মদ্যপানের অপরাধে তিনি স্বহস্তে ৮০ বেত্রাঘাত করেন। এই বেত্রাঘাতের যন্ত্রণায় আবু-শাহ্‌মার প্রাণ বিয়োগ ঘটে। স্নেহ বাৎসল্য তাঁহাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারে নাই। হায়! এমন স্থায় ও নিরপেক্ষ বিচারের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কি জগতে হইবে? (১)

রাজর্ষি ফারুকের শান্তি প্রতিষ্ঠার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই যে, আধুনিক সুসভ্য বিজেতার স্থায় রাজ্যোদ্রোহী অনুমান করিয়া বিনা বিচারে কাহাকেও বন্দী করা হয় নাই। ফাঁসী কাষ্ঠের ব্যবহার একেবারে অচল ও অপরিজ্ঞাত ছিল। আরবের এহুদী ও খৃষ্টানদিগের নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হইয়াছিল বটে। কিন্তু সে কেমন করিয়া? প্রত্যেক পরিবারের ত্যাজ্য সম্পত্তির স্থায্য মুল্য ধার্য্য করতঃ তাহা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করা হইয়াছিল এবং অপর দেশে তাহাদের জন্য বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দুই বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত সম্প্রদায়কে জিজিয়া হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। মধ্যপথে তাহাদিগকে যেন কোন প্রকার ক্লেশ পাইতে না হয়, তজ্জন্য তথাকার শাসনকর্ত্তাগণকে ফরমান পাঠাইয়া দিলেন, তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যেন সুব্যবস্থা করা হয়।

ইতিহাসে দেখা যায়, একমাত্র আমর বিন্‌ আ'ছ ব্যতীত অন্য কোন

(১) كتاب الخراج

শাসনকর্ত্তাকে তিনি অধিক দিন একস্থানে রাখেন নাই। সময় এবং সুযোগানুসারে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিতেন। যাঁহার শক্তির অধিক প্রভাব অনুভব করিতেন, তাঁহাকে মদিনায় বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে লইয়া আসিতেন। হজরত আবদুর রহমান বিন্ আউফ একদা ফারুকে আ'জমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আপনি আমাদিগকে মদিনার বাহিরে প্রেরণ করেন না কেন?" উত্তরে ফারুকে আ'জম বলিলেন, "**এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেয়ে না দেওয়াই ভাল।**" সম্ভবতঃ আবদার বৃদ্ধি পাইবে ভাবিয়া স্ববংশের লোক দিগকে মদিনার কোন শাসন-বিভাগে তিনি নিযুক্ত করিতেন না। বিদ্রোহের আশঙ্কায় কোন হাশেমীকে খাছ আরবের কোন উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন নাই।

রাজ্যের বিভিন্ন অংশের ও বিভিন্ন শাসনকর্ত্তাগণের কার্য্যকলাপের সংবাদ যে চতুরতা ও সাবধানতার সহিত তিনি সংগ্রহ করিতেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক তবরী লিখিয়াছেন,—

وكان عمر لا يخفى عليه شئ فى عمله كتب اليه من العراق بخروج من خرج ومن الشام بجايزة من جيز فيها

অর্থাৎ হজরত ফারুকের নিকট কোন দেশের কোন কথাই গোপন থাকিত না। শাম ও এরাকের খুঁটি-নাটি সংবাদ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট পঁহুছিত।

বিজিত দেশের ধর্ম্ম, আচার পদ্ধতি এবং অতীত শাসন প্রণালীর জ্ঞান লাভের নিমিত্ত তথাকার অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট লোকদিগকে দরবারে স্থান দিয়া তাঁহাদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। (১)

---

(১) طبری

হেফাজতে এছলাম



বিশ্বনবীর যোগ্য শিষ্য এবং স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হিসাবে এছলামের শিক্ষাসৌন্দর্য্য বিস্তার ও তাহার সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা ফারুকে আ'জম করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত ইতিহাসই বোধ হয়, বর্ত্তমান মোছলেম জাতির পক্ষে সঞ্জীবনী সুধা! বিস্তৃত ইতিহাস স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে সঙ্কলনের সঙ্কল্প করিয়াছি; তাহারই মুখবন্ধরূপে এই পুস্তকে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

খৃষ্টান জগতের ন্যায় "মিশন" স্থাপনপূর্ব্বক এছলাম প্রচারের কোন ব্যবস্থা ফারুকী আমলে হয় নাই। কিন্তু হজরত ফারুক বিশ্বাসী মণ্ডলীকে এমনই ভাবে গঠন করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক মোছলেমই এক এক জন সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রচারকে পরিণত হইয়াছিলেন। এমাম আবু ইউছুফ ছাহেব লিখিতেছেন,—"সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনে অপরাপর যোগ্যতার সহিত এছলামী শাস্ত্রে তাঁহাদের জ্ঞান ও অধিকার অবশ্য বিবেচ্য ছিল।" দাওতে এছলাম তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য ছিল। ঈরাণ-বিজয়ী সেনাপতি ছা'দ বিন অকাছকে হজরত ফারুক এক ফরমানে লিখিয়াছিলেন,—

وقد كنت امرتك ان تدع من لقيت الى الاسلام قبل القتال

যখনই বিপক্ষের সম্মুখীন হইবে তখন অর্থাৎ যুদ্ধে লিপ্ত হইবার

পূর্ব্বে তাহাদিগকে এছলামের দাওৎ দিও। সকল সময়ের জন্য আমার এই আদেশ মনে রাখিও।

ফৌজের শিক্ষা ও শাসনের সুব্যবস্থার ফলে তাঁহাদের চরিত্র এত সুন্দর চিত্তাকর্ষী ও সুজনতাপূর্ণ হইয়াছিল যে, তদ্দর্শনে বিধর্ম্মীগণ আপনা আপনি এছলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। যাঁহারা এদেশে খৃষ্টান মিশনারী ও হাইল্যাণ্ডার সৈন্যের আচরণ দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই তাৎপর্য্য অনায়াসে অনুধাবন করিতে পারিবেন। হাইল্যাণ্ডার সৈন্যের আচরণ যদি মিশনারীর ন্যায় বিনয়াবত হইত, ভারতের ধর্ম্মরাজ্যের অবস্থা সম্ভবতঃ অন্যরূপ হইত।

মিছর ও পারশ্যের সহিত ভারতের এছলাম প্রচারের অবস্থা তুলনা করিলে ফারুকে আ'জমের এই ব্যবস্থার সুফল হৃদয়ঙ্গম করা আরও সহজ হইয়া পড়িবে। পূর্ণ সাত শত বৎসরের মোছলেম শাসনেও রাজকীয় প্রভাবে কোন গণ্যসংখ্যক ভারতীয় অ-মোছলমান এছলামের আশ্রয় লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই। যে সামান্যসংখ্যক আর্য্য অনার্য্য এছলামের শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া নবজীবন লাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহাও মাত্র কতিপয় সাধু মোছলেমের চরিত্র প্রভাবে। (১) অন্যদিকে আমরা দেখিতে পাই, মিছর ও পারশ্য প্রভৃতি দেশে জয়ের সঙ্গে সঙ্গে এহুদী ও খৃষ্টানগণ এছলামের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। ফলতঃ যে দিন হইতে শাসক ও মোজাহেদগণ এছলামের এই আদর্শ হারাইয়াছেন সেই দিন হইতে মোছলেম জাতির অধঃপতনের প্রথম সূচনা। ইউরোপে তুর্কীর অকৃতকার্য্যতারও এই একই কারণ।

হজরত ফারুকের এছলাম প্রচারের প্রকৃত দর্শন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক গণ বুঝিতে সক্ষম হন নাই। আর এক দল বুঝিয়া সুঝিয়াও শয়তানী

(১) মওলানা এছলামবাদী ছাহেবের "ভারতে এছলাম প্রচার" দ্রষ্টব্য।

বশতঃ এছলাম প্রচারে বল প্রয়োগের দোষারোপ করিতেছে। যাহারা জঙ্গে-বদর হইতে পরবর্ত্তী যুদ্ধ সমুহের সত্যিকার কারণ অনুসন্ধান করিবেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, কোন দেশে ও কোন যুগে এছলাম প্রচারে বল প্রযুক্ত হয় নাই। বরং যুগে যুগে সত্যসন্ধ মানবগণ এছলামের শিক্ষা-সুমায় মুগ্ধ হইয়া আপনা হইতেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন।

কোর্ আনে হাকিম ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচারে বল প্রয়োগ নিষেধ করিয়াছে। কোরআনের স্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও তাহার আজ্ঞাবাহীগণ তাহারই নামে বল প্রয়োগ করিয়াছে, মানুষ আত্মস্থ থাকিয়া উহা বিশ্বাস করে কি কিরূপে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না।

হজরত ফারুক আপন গোলামকে যুক্তিযুক্ত উপদেশের দ্বারা এছলামে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করেন। বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে বলিলেন, لا اكراه فى الدين "ধর্ম্ম বিশ্বাসে জোর জবরদস্তি নাই।"

হেফাজতে এছলামের প্রধানতম অঙ্গ হেফাজতে কোর্আন, তাহাতে কোন মতদ্বৈত নাই। সর্ব্বপ্রথমে হজরত ফারুক কোরআন মজিদের ছুরাগুলি একত্রে লিপিবদ্ধ করাইয়া রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে বিতরণ করেন। তিনি মছজেদে মছজেদে কোর্আন শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পঠন ও উচ্চারণের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোর্আন মজিদের অর্থ গ্রহণে যাহাদের অধিকার নাই, এমন লোককে কোর্আন শিক্ষা দিবার ভার কখনও অর্পণ করেন নাই। পক্ষান্তরে স্থায়ীভাবে বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য কোরআন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরবী সাহিত্য চর্চ্চারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আরবী বানানের লিখন ও পঠন সম্বন্ধে অসংখ্য মক্তব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাযাবর বদ্দুদিগের জন্য

কোরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন। ফলে লক্ষ লক্ষ হাফেজে-কোরআনের উৎপত্তি হইয়াছিল। দেখিয়া কোরআন পড়িবার লোকের সংখ্যাত লেখাযোখা ছিল না। এক দেমস্কের মছজেদে ১৬০০ শিক্ষার্থী ছিল। আবু-দর্দ্দা এখানকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ফজরের নামাজের পর এই মক্তব বসিত। দশ দশ জন করিয়া ছাত্রগণের শ্রেণী ভাগ করা হইত। আবু-দর্দ্দা প্রত্যেক শ্রেণী পরিদর্শন করিতেন। মক্তব শিক্ষকগণের যথারীতি বেতন নির্দ্ধারিত ছিল। (১)

কোরআনে মজিদের সহিত হাদিছ শিক্ষারও সুবন্দোবস্ত ছিল। হাদিছ শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। এতৎ সম্বন্ধে তিনি যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কালে তাহাই "অছুলে হাদিছ" শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এছলামের আরকান ও আহ্‌কাম শিক্ষা দানের প্রতিও অমনোযোগী ছিলেন না। শাসনকর্ত্তাগণের প্রতি তাঁহার উপদেশ ছিল,—

انی اشهد کم علی امراء الا مصار انی لم ابعثهم الا يفقهون الناس فی دینهم

অর্থাৎ—জনসাধারণকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়া শাসনকর্ত্তাগণের কর্ত্তব্য।

এই সকল শিক্ষা দানের কেন্দ্র ছিল মছজেদ। হজরত ফারুকের আদেশে রাজ্যের স্থানে স্থানে বহু মছজেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মছজেদের সংখ্যা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল মছজেদে যথারীতি "অজিফাখার" এমাম ও মোঅজ্জেন নিযুক্ত থাকিতেন। এবনে জৌজী লিখিতেছেন,—

---

(১) ابن الجوزی و کنز العمال

ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يرزقان المؤذنين والائمة

অর্থাৎ খলিফা হজরত ওমর ও হজরত ওছমান বেতনভোগী এমাম ও মোঅজ্জেন নিযুক্ত করিতেন। লোকশিক্ষার ভার এই সকল এমাম ও মোঅজ্জনের উপরই ন্যস্ত হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। এতদ্ব্যতীত যে সকল অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদেরও কেন্দ্র মছজেদেই ছিল। (২)

হজরত ফারুক বায়তুল্লাহ শরীফ ও মছজেদে নববীর যথেষ্ট খেদমত করিয়াছেন। হিজরী সপ্তদশ সালে তিনি কা'বাগৃহের ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণের বিস্তৃতি সাধন করেন। আরও নানা প্রকারে গেলাফ শরীফ ও খানায়ে কা'বার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। তিনি এই বৎসর মছজেদে নববীর ও বিস্তৃতি সাধন করেন।

(২) জিম্মীদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা তাহাদের সামাজিক সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত থাকিত।

এজ্‌তেহাদ



ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত জ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ। অনেক পণ্ডিত লোকও এই সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া ভক্তি ও বিশ্বাসকে অন্ধ আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রম। অসম্পূর্ণ বা ভ্রমাত্মক জ্ঞানের ভিত্তির উপর ভক্তিবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা কোনরূপে সম্ভব নহে। যে হতভাগা মানুষ অচেতন ও শক্তিহীন সৃষ্ট পদার্থকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা বলিয়া পূজা করে, সে তাহার ভ্রমাত্মক জ্ঞানের দ্বারাই এহেন পাপ কার্য্যে লিপ্ত হয়। কারণ সে যদি জানিত যে, সেই পদার্থটি বাস্তবিকই অচেতন ও শক্তিহীন তাহা হইলে সে কখনও এইরূপ পাপে লিপ্ত হইত না।

সাধারণতঃ প্রত্যেক ধর্ম্মের বিধান বা আদেশ নিষেধগুলি স্পষ্ট ও পরিষ্কার হইলেও ব্যবহারিক জীবনে ধর্ম্মবিধানের আচরণে নানারূপ খট্‌কা আসিয়া উপস্থিত হয়। দেশ ও কাল বিভিন্ন প্রকারের জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। তখন স্বাধীনচিন্তার কষ্টি পাথরে জ্ঞানকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। এছলামী শাস্ত্রে এই পরীক্ষার নাম এজে্‌তেহাদ اجتهاد।

সকল ধর্ম্মের মধ্যে এছলামের আদেশগুলি সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও সরল, ইহা অবিসম্বাদিত। তথাপি হজরত ফারুক এছলামী বিধান সমূহকে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর করিয়া বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতেন। হোদায়বিয়ার সন্ধি ব্যাপারে হজরত ফারুক আকা খায়রুল্ বশরকে কি ভাবে প্রশ্নের

উপর প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে। অফাতে খায়রুল্‌-বশরের পর এছলাম ও এছলামী সাম্রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুরু ও জটিল প্রশ্ন সমূহ আসিয়া ফারুকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। হজরত ফারুক ছাহাবীগণের সাহায্যে স্বাধীনচিন্তা ও বিচার বুদ্ধিরদ্বারা এই সকল সমস্যার সমাধা করিতেন। স্বাধীন চিন্তার অসাধারণ শক্তি বলে, তিনি যে সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত এই অধ্যায়ে উপস্থিত করিব।

খানায়ে কা'বার 'হজরে আছ্‌ওদ' حجراسود নামে যে কৃষ্ণ প্রস্তর আছে তাহার তা'জিম করা এছলামের বিধান। এই অচেতন প্রস্তরের নামে তা'জিমের সীমা অতিক্রম করতঃ এছলামে যাহাতে কোন প্রকার গলৎ প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য সেই কৃষ্ণ প্রস্তরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া হজরত ফারুক বলিতেন,

انی اعلم انک حجروانک لاتضرو لاتنفع

"আমি জানি, তুমি প্রস্তর বই নহ এবং তুমি কাহারও ক্ষতি বৃদ্ধি করিতে পার না।"

হোদায়বিয়ার সন্ধি প্রসঙ্গে বায়আতুশ্‌ শজরার بیعۃ الشجرہ ঘটনা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। যে বৃক্ষতলে এই বায়আৎ গৃহীত হইয়াছিল, কালে উহা পবিত্র ও পুণ্যময় বিবেচিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া আসিয়া উহার জেয়ারত আরম্ভ করিল। এতদ্দর্শনে হজরত ফারুক সমূলে সেই বৃক্ষের উচ্ছেদ সাধন করেন। (১)

একদা হজ হইতে মদিনা প্রত্যাবর্ত্তন কালে হজরত ফারুক দেখিলেন,

---

(১) ازالۃالخفا

লোকগণ কোন এক মছজেদে নমাজ পড়িবার জন্য দৌড়াইতেছে। কেন না নবী করিম এই মছজেদে একবার নমাজ পড়িয়াছিলেন। অতঃপর সেই মছজেদে নমাজ-পড়াকে লোকে অধিকতর পুণ্যের হেতু মনে করিত। হজরত ফারুক তখন এই সকল লোককে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন, **"এহুদী ও নছারাগণ এই জন্যই নষ্ট হইয়াছে যে, তাহারা স্ব স্ব নবীর স্মৃতি সমূহকে আপনাদের উপাস্য মনে করিত।"** (১)

"তক্‌দীর" প্রশ্নের মীমাংসা এছলাম অতি সুন্দর রূপেই করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অনেক পণ্ডিতই কোরআন মজিদের অদৃষ্টবাদ বুঝিতে ভ্রম করেন। কেহ কেহ তক্‌দীরের দর্শন বুঝিতে অসমর্থ হইয়া উহাকে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। আবার কেহ কেহ কার্য্যকারণ সম্পর্কের বিষয় ভুলিয়া বসে। মহা মনীষী ফারুক তক্‌দীর-প্রশ্ন আয়ত্ত করিয়া অতি সুন্দর ভাবেই তাহার ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন।

হজরত ফারুক যখন শাম ভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন তথায় আমওয়াছে ভীষণ মহামারী উপস্থিত হয়। তিনি সেই স্থান পরিত্যাগে উদ্যত হইলে হজরত আবু-ওবায়দা অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন,

افرارًامن قدرالله

"তুমি কি আল্লাহ তাআলার নির্দ্দিষ্ট অদৃষ্টলিপির বিধান এড়াইতে চলিয়াছ?" তদুত্তরে হজরত ফারুক তক্‌দীরের দর্শন ব্যাখ্যা পূর্ব্বক বলেন,

نعم نفر من قدرالله الى قدر الله

---

(১) ازالة الخفا

"হাঁ, অদৃষ্টলিপির এক বিধানকে ছাড়িয়া আর এক বিধান গ্রহণ করিতেছি" (১)

হজরত ফারুকের তথা এছলামের এই দর্শন প্রাচ্য পণ্ডিত অপেক্ষা মধ্যযুগের ·প্রতীচ্য পণ্ডিতগণই ভাল বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা অনেক আলোচনা ও গবেষণার পর ফারুকের দর্শন গ্রহণ করিয়াছেন। কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন, To know the future is a crime; but to guard against it is certainly a virtue. অর্থাৎ অদৃষ্ট-লিপির জ্ঞান অর্জ্জনের চেষ্টা করা পাপ হইলেও তজ্জন্য সাবধান থাকাই সাধু ও উত্তম। আর—

القدر خيره و شره من الله تعالے

বলিয়া যাহারা ঈমান আনিয়াছে, সেই মো'মেনকে ছিন্ন পুঁথি ও করাঙ্কে অদৃশ্য অদৃষ্ট গণিতে দেখিলে হৃদয় স্বতই বিদীর্ণ হয়!

হজরত ফারুকের স্বাধীন চিন্তার গভীরতা ও বুদ্ধির প্রখরতার আর এক দৃষ্টান্ত 'বাগে-ফেদকের' উত্তবাধিকার-সমস্যার মীমাংসায়। আজিকার দিনে এই সমস্যার মীমাংসা খুব জটিল নাও বোধ হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম যখন এই প্রশ্ন মীমাংসা-সাপেক্ষ হইয়াছিল তখন উহা বাস্তবিকই জটিল ছিল। এছলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এহুদীগণই এই বাগে-ফেদকের মালিক ছিল। খায়বর বিজয়ের পর তথাকার এহুদীগণ স্বেচ্ছায় ইহার অর্দ্ধাংশ ত্যাগ পূর্ব্বক মোছলমানদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করে এবং তদবধি উহার আয়ের দ্বারা হজরত রছুলে মকবুলের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে থাকে। অফাতে-রছুলের পর ইহার উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে মতভেদে সৃষ্টি হয়। কিন্তু

(১) صحيح مسلم

হজরত রছুলে মকবুলের বংশগত উত্তরাধিকারগণের দাবী হজরত ফারুক একেবারে অস্বীকার করেন। এতৎসম্বন্ধে মৌলিক ঘটনার বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনা না করিয়া তাঁহার মতামত ও কার্য্য প্রণালী তাঁহার নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করিতেছি,—

فكان رسوالله ينفق على اهله نفقة سنتهم من هذاالمال ثم ياخذ ما بقى فيجعله كجعل مال الله فعمل رسول الله بذلك حياته ثم تو فى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر انا ولى رسول الله فقبضها ابوبكر فعمل فيها بما عمل رسول الله ثم تو فى الله ابابكر فكنت انا ولى ابى بكر فقبضتها سنتين من امار تى اعمل فيها عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها ابو بكر -

অর্থাৎ এই সম্পত্তি হইতে রছুলুল্লাহ্ নিজের জীবনযাত্রার সম্বৎসরের খরচ লইতেন এবং অবশিষ্ট ওয়াকৃফ সম্পত্তির নিয়মানুসারে ব্যয় করিতেন। তাঁহার অফাতের পর তাঁহাব অলিরূপে আবুবকরও এইরূপভাবে উহার ব্যবহার করিয়াছেন। আবুবকরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া আমিও দুই বৎসর এইভাবে উহার ভোগ ও ব্যবহার করিয়াছি। (১)

হজরত ফারুক হাদিছের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের জন্য যে সকল নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহাই আজ শাস্ত্রের পরিভাষায় "অছুলে হা'দিছ" (اصول حديث) আর বিশ্বসভ্যতার বিচার-নিয়ন্ত্রণে 'কানুনে-শা'াদৎ' (Law of evidence.)

---

(১) مسلم

এতৎসম্পর্কে যে নিয়ম প্রণালী তিনি গঠন করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহা এইরূপ ঃ—

(১) রেওয়ায়েৎ যথাযথ ও শাব্দিক হওয়া আবশ্যক ।

(২) রেওয়ায়েৎ বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে শুধু রাবীর বিশ্বাসী হওয়াই যথেষ্ট নহে।

(৩) প্রত্যেক রাবীর সমর্থক থাকা আবশ্যক।

(৪) সমর্থন ব্যতীত কোন হাদিছ সর্ব্বত্র দলিলরূপে ব্যবহৃত হইবে না।

(৫) কোন রেওয়াৎকে বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে কাল ও পাত্র অবশ্য বিবেচ্য * ইত্যাদি।

এতৎসম্পর্কে হজরত ফারুক কতদূর সাবধান ছিলেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

একদা আবু মূছা আশ্‌আরী হজরত ফারুকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া তিনি একে একে তিনবার প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হজরত ফারুক কার্য্যান্তরে লিপ্ত থাকায় আবুমূছার উত্তর দানের প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। অনুমতি না পাইয়া আবুমূছা আশ্‌আরী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বারান্তরে সাক্ষাৎকার হইলে হজরত ফারুক আমূবুছাকে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে আবু মুছা আশ্‌আরী বলিলেন, আমি রছুলে করিমের নিকট শুনিয়াছি যে, "তিনবার অনুমতি ভিক্ষার পরও যদি অনুমতি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ফিরিয়া যাইবে।" উত্তর শুনিয়া ফারুকে আ'জম বলিলেন,—

* "অছুলে হাদিছ" সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছাহেব বিরচিত "মোস্তফা-চরিতের" উপক্রমণিকা খণ্ড দ্রষ্টব্য।

"তুমি ইহার শাহেদ বা সমর্থক উপস্থিত কর, অন্যথায় আমি তোমাকে শাস্তি দিব।" তদনুসারে আবু-মূছা সাক্ষ্য উপস্থিত করিলে, হজরত ফারুক বলিলেন,—"হাদিছের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্যই তোমার নিকট ইহার প্রমাণ চাহিয়াছিলাম।"

এছলামের বিধানানুসারে ত্যাজ্য স্ত্রী স্বামীর নিকট নির্দ্দিষ্ট কালের খোরপোষ পাইয়া থাকে। এই খোরপোষের মছ্আলা কোরআন মজিদের দ্বারা প্রমাণিত হয়। ফাতেমা বিন্তে-কায়ছ নামে কোন এক পরিত্যক্তা স্ত্রী ফারুকে আ'জমের সম্মুখে এক হাদিছ বর্ণনা করিয়া বলেন যে, "আমার স্বামী আমাকে তালাক দিলে ইদ্দতকালের খোরপোষের জন্য আমি নবী করিমের নিকট নালিশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে উহা ডিক্রি দেন নাই।" এই বর্ণনা শুনিয়া হজরত ফারুক বলিলেন,—

لانترك كتاب الله بقول امرءة لاندرى حفظت اونسيت

অর্থাৎ একটি স্ত্রীলোকের কথায় আমরা আল্লাহ তাআলার কেতাব কোরআন মজিদকে অগ্রাহ্য করিতে পারি না। এই স্ত্রীলোকটী রছুলের হাদিছ মনে রাখিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

হজরত আব্বাছের কোন মোকদ্দমার বিচারকালে এক হাদিছ উপস্থিত করা হয়। হজরত ফারুক তাহার সমর্থক উপস্থিত করিতে আদেশ দেন। সমর্থক উপস্থিত করা হইলে ফারুকে আ'জম বলিলেন, তোমাদের প্রতি আমার অবিশ্বাস ছিল না। তথাপি হাদিছের সত্যতা সম্বন্ধে সন্তোষ লাভের জন্য আমি প্রমাণ চাহিয়াছিলাম।

বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল খৃষ্টান মিশনারীর লিখিত "Sayings of Mohammad" পড়িয়া আমাদের কোন কোন ইংরেজী শিক্ষিত ভ্রাতা নানা কল্পিত কাহিনী হাদিছের নামে প্রচার করিতে আদৌ কুণ্ঠা বোধ করেন না।

ফল কথা হজরত ফারুক স্বাধীন চিন্তার দ্বারা যে সকল বিষয়ে মীমাংসা করিয়াছেন এবং স্বাধীন চিন্তার প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম কানুনের সৃষ্টি করিয়াছেন, এক বিরাট গ্রন্থ রচনা ব্যতীত তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নহে। হজরত ফারুকের প্রাচীন ও আধুনিক জীবনী লেখকগণ তাঁহার চিন্তা প্রসূত কার্য্যাবলীর এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। আমার নিকট আল্লামা শিবলী ছাহেবের রচিত তালিকা সংক্ষিপ্ত অথচ অপেক্ষাকৃত সুন্দর বলিয়াই বোধ হইল। সুতরাং "আল্-ফারুক" হইতে এই তালিকার লিখিত কার্য্যাবলীর অনুবাদ করিয়া দিলাম, যথাঃ—

(১) বায়তুল-মাল স্থাপন
(২) আদালতের প্রতিষ্ঠা ও কাজী নিয়োগ
(৩) সন ও তারিখের প্রচলন
(৪) "আমিরুল-মো'মেনীন" উপাধির সৃষ্টি
(৫) সেনাবিভাগের প্রতিষ্ঠা
(৬) স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদিগের বেতন নির্দ্ধারণ
(৭) আয়কর বিভাগের সৃষ্টি
(৮) জরিব-পয়মায়েশের প্রথা
(৯) লোক গণনা
(১০) নাহর খনন
(১১) সাম্রাজ্যের প্রদেশ বিভাগ
(১২) নগর পত্তন
(১৩) আশূর কর নির্দ্ধারণ
(১৪) সমুদ্রের উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি কর স্থাপন
(১৫) অমোছলেম অধ্যুষিত দেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন

(১৬) জেলখানা নির্ম্মাণ ও জেল শাস্তির ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন

(১৭) বেত্রাঘাতের নিয়ম প্রবর্ত্তন

(১৮) রাত্রিকালে গশ্‌ত করিয়া প্রজার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ

(১৯) পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠা

(২০) ফৌজী ছাউনি বা ব্যারাক স্থাপন

(২১) অশ্বের বংশ নির্ণয়

(২২) সংবাদ সংগ্রাহক নিয়োগ

(২৩) মক্কা মোআজ্জমা ও মদিনা মোনওয়ারার মধ্যে স্থানে স্থানে পান্থবাস নির্ম্মাণ

(২৪) নিরুদ্দিষ্ট বালক বালিকার প্রতিপালন

(২৫) মেহ্‌মান-খানা স্থাপন

(২৬) দাসপ্রথা নিবারণ

(২৭) দীন দরিদ্রের বৃত্তি নির্দ্ধারণ

(২৮) মক্তব প্রতিষ্ঠা

(২৯) শিক্ষকবর্গের বেতন নির্দ্ধারণ

(৩০) কোরআন মজিদের তর্ত্তিব্‌

(৩১) কেয়াছ বা ফেকৃহা শাস্ত্রের নিয়ম প্রণালী গঠন

(৩২) ফরাএজের আ'ওল (عول) মছআলার আবিষ্কার

(৩৩) ফজরের আজানে الصلوة خير من النوم বলার প্রথা প্রবর্ত্তন

(৩৪) তারাবিহ্‌ নামাজে জমআতের প্রচলন

(৩৫) এক সঙ্গে তিন তলাক দিলে তেলাকে বায়েন বলিয়া গণ্য হওয়ার ব্যবস্থা দান

(৩৬) মদ্যপানের জন্য ৮০ বেত্রাঘাত শাস্তি নির্দ্ধারণ

(৩৭) বাণিজ্য অশ্বের প্রতি জকা'ৎ স্থাপন

(৩৮) বনু তগলব বংশের প্রতি জিজিয়ার পরিবর্ত্তে জকা'ৎ কর আদায়ের ব্যবস্থা

(৩৯) ওয়াকৃফ প্রথার প্রবর্ত্তন

(৪০) জনাজার নমাজে চারি তকবীরের ব্যবস্থা

(৪১) মছজেদে ওয়াজের নিয়ম প্রবর্ত্তন

(৪২) বেতন ভোগী এমাম ও মোঅজ্জেন নিয়োগ

(৪৩) মছজেদে আলোর ব্যবস্থা

(৪৪) নিন্দাপূর্ণ কবিতার (Satire) রচনার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা, খোদা তাআলা তওফিক দিলে, অপর খণ্ডে করিব।

জ্ঞান-সেবা



এছলামের স্নিগ্ধ ছায়া তলে আশ্রয় লইবার পূর্ব্বে হজরত ওমর বিন্ খত্তাব লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা করিবার যথেষ্ট শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ছহাবী জীবনে কোরআন ও হাদিছের জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বিবিধ শিক্ষায় আরও বহু উন্নতি করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ইব্রাণী (Hebrew) ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। নবী করিমের জীবদ্দশা য় তত্তরিৎ (Old Testament) আরবী ভাষায় অনুদিত হয় নাই। এহুদীগণ যখন তওরিৎ আলোচনা করিত তখন হজরত ফারুক তাহাদের সেই আলোচনায় যোগদান করিতে যাইতেন। এইজন্য হজরত ফারুক এহুদীগণের নিকট খুব সুপরিচিত ছিলেন এবং তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত ও সম্মান করিত। (১) এই জ্ঞানান্বেষণের ফলে তওরিতের উপরও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার জন্মিয়াছিল। ইতিহাসে দেখা যায়, কোন বিশেষ সময়ে তিনি একবার রছুলে মকবুলকে তওরিৎ পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।

হজরত ফারুক তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে সাহিত্যামোদ ও সাহিত্য চর্চ্চায় কম কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাই। মাঝে মাঝে তিনি স্বয়ং কবিতাদি রচনা করিতেন এবং সমালোচনায় তিনি অতিশয় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তদনীন্তন সমালোচকদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চে ছিল। তদানীন্তন সাহিত্যিকদিগের মতে—كان عمر بن الخطاب اعلم الناس بالشعر

অর্থাৎ হজরত ওমর বিন্ খত্তাব কবিতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক ছিলেন। হজরত ফারুকের কবিতা সমালোচনা সম্বন্ধে আল্লামা শিবলী ছাহেব আল্লামা রশিকের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন,

اوكان من انقد اهل زمانه للشعر وانفذ هم فى معرفة

অর্থাৎ হজরত ওমর অদ্বিতীয় সমালোচক ছিলেন।

আরবের প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে জোহের নাবেগা আর এমরউল-কায়ছ এই তিন জন সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী কবি বলিয়া খ্যাত। কিন্তু এই তিন জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কে, তাহা লইয়া আজও পর্য্যন্ত সমালোচকদিগের অনেক মতভেদ চলিতেছে। কিন্তু হজরত ফারুকের মতে জোহেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে তিনি বলিতেছেন,—

لانه لايتبع حوشى الكلام ولا يغا طل من المنطق ولا يقول

الا بما يعرف ولا يمتدح الرجل الا بما يكون فيه

অর্থাৎ জোহেরের শব্দাবলী সর্ব্বজন পরিচিত এবং বর্ণনা সরল ও সুন্দর অথচ তাহাতে অতিরঞ্জন নাই। তাঁহার উপমা হৃদয়গ্রাহী অথচ তাহাতে বাহ্যাড়ম্বর নাই। বলা বাহুল্য যে, জগতের সাহিত্য রথিবৃন্দ আজ সেই সারল্য ও সৌন্দর্য্যের সন্ধান করিতেছেন, যাহা সার্দ্ধ তের শত বৎসর পূর্ব্বে হজরত ফারুক পছন্দ করিয়া গিয়াছেন।

জোহের, নাবেগা ও এমরউল-কায়ছ এই তিন আরব-কবির মধ্যে ভারতবর্ষে এমরউল কায়ছই সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে হজরত ফারুকের মতামত কি, তাহা জানিবার ঔৎসুক্য পাঠকগণের পক্ষে স্বাভাবিক। হজরত ফারুক তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন,

سابقهم خسف لهم عين الشعر وافتقر عن معان عور اصح بصر

অর্থাৎ তিনি কবিকূলগুরু; কেননা বদ্ধ নির্ঝরিণী মুখ খুলিয়া তিনি জলস্রোত বাহির করিয়াছেন এবং নীরসকে সরস করিয়াছেন ইত্যাদি।

হজরত ফারুক কবি ও কবিতার যথেষ্ট আদর করিতেন। অবসর সময়ে তিনি কবিদিগের সম্মিলন করিতেন। তন্ময় তদ্‌গত হইয়া কবিতা শ্রবণ করিতেন। প্রাক্ এছলামী যুগে আরবে নানাপ্রকার অশ্লীল কবিতার প্রচার ছিল। হজরত ফারুকের চেষ্টায় তাহার প্রচার ও অশ্লীল কবিতার রচনা একেবারে বন্ধ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে সৎসাহিত্যের প্রচার কল্পে বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। নীতিপূর্ণ কবিতার প্রচার কল্পে তিনি কতদূর যত্নবাণ ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার নিম্ন ফরমানেই পাওয়া যাইবে। আবু মূছা আশ্‌আরীর নামীয় কোন ফরমানে তিনি লিখিয়াছিলেন,

مر من قبلك بتعلم الشعر فانه يدل علے معانی الا خلاق وصواب الراي

"কবিতা শিক্ষার প্রতি লোকদিগকে আকর্ষণ কর। কেননা উহা মত ও চরিত্র গঠনের সাহায্যক।"

প্রাদেশিক শাসনকর্তার নামে আর এক ফরমানে লিখিয়াছিলেন,

علموا اولا دكم العوم والفرو سية ورؤهم ماسار من المثل وحسن من الشعر

"তোমাদের সন্তানদিগকে সন্তরণ ও অশ্বারোহণ শিক্ষা দাও। হিতোপদেশপূর্ণ প্রবচন ও নীতিপূর্ণ কবিতা শিক্ষা দাও।" [১]

---

(১) ازالة الخفا

প্রাক্‌এছলামী যুগে সাহিত্য বলিতে আরবদেশে আরবী কবিতাকেই বুঝাইত। কোরআন মজিদই বোধ হয়, আরবী সাহিত্যের এই স্থিতি স্থাপকতা প্রথম ভঙ্গ করে। তারপর হাদিছের স্থান। কোরআন মজিদ ও হাদিছ শরীফের বহুল প্রচারের দ্বারা ধর্ম্ম সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হয়। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে হজরত ফারুকের যে সকল 'খোৎবা' ও 'ফরমান' তৎসমুদয় আরবী সাহিত্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। গদ্য সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে তাঁহার 'খোৎবা' ও 'ফরমান সমূহ আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে।

হজরত ফারুক ছাহাবীগণের সমবায়ে নানা জ্ঞান চর্চ্চায় নিমগ্ন থাকিতেন। শাহ অলিউল্লাহ্‌ ছাহেব লিখিতেছেন,

كان من سيرة عمر انه كان يشاور الصحابة و يناظرهم حتى تنكشف الغمة و ياتيه الثلج فصار غالب قضاياه وفتاواه متبعة في مشارق الارض ومغاربها -

অর্থাৎ হজরত ফারুকে আ'জম ছাহাবীগণের পরামর্শ গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন। **তাঁহাদের আলোচনা গুলি এত দীর্ঘ, বিভিন্নমুখী ও সুচিন্তাপূর্ণ হইত যে, সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া সত্যের স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া যাইত। তাই তাঁহার আইন ও ব্যবস্থাসমূহ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সর্ব্বত্র সমভাবে সমাদৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে!** ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিবিধ বিজ্ঞান দর্শন সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইত, জিজ্ঞাসুগণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহা দেখিয়া লইতে পারেন।

হজরত ফারুকের যে সকল নীতিকথা সাহিত্যের অলঙ্কার হইয়া আছে,

তৎসমুদয়ের কয়েকটী পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া নিরস্ত হইব ; —

اعقل الناس اعذرهم الناس

সে ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, যে স্বকার্য্যের উচিত সমালোচনা করিতে পারে।

من كتم سره كان الخيار في يده

আত্মবশব্যক্তি সে, যে নিজের গোপন-কথা প্রকাশ করে না।

سيد القوم خادمهم

সেবকই জাতির নেতা।

اتقوا من تبغضو قلوبهم

যাহাকে তুমি ঘৃণা কর, তাহাকে ভয় করিও।

لا تؤخر عمل يومك الى غدك

অদ্যকার কর্ত্তব্য কার্য্য কল্যকার জন্য রাখিয়া দিও না।

رحم الله امرء اهدے الى عيوبى

যে ব্যক্তি আমার দোষত্রুটি আমার নিকট ধরে, আল্লাহ্ তাহাকে অনুগ্রহ করুন!

لوان الصبر والشكر بعيران ما باليت على ايهماركبت

ধৈর্য্য ও সন্তোষ যদি দুইটি যান হইত,

কোন্‌টীতে আরোহণ করিব, তাহার কোন ভাবনা আমার হইত না।

لی علی کل خائن امینان الماء والطین

প্রত্যেক ঘাতকের পিছনে আমার দুইজন দারোগা আছেন,—জল ও মৃত্তিকা।

اقلل من الدنیا تعش حراً

অল্পে সন্তুষ্ট হও, তবে জীবনে স্বাধীন হইবে।

لا یلھک الناس عن نفسک

আত্মস্থ থাকিয়া পরচিন্তা করিও।

ما سأ انی رجل الا تبین لی فی عقلہ

জিজ্ঞাসাতে মানুষের বুদ্ধির পরিচয় হয়।

من لم یعرف الشر یقع فیہ

যাহার নিকট মন্দের জ্ঞান নাই, সে মন্দ কার্য্যে লিপ্ত।

ابت الدراھم الا ان یخرج اعنا قھا

ধনেই গর্ব্বের সৃষ্টি।

ما ادبر شئی فا قبل

গতির দুই মুখ নাই।

ফারুক

খলিফা হজরত ওমর-বিন্-খত্তাবকে 'ফারুক' নামে অভিহিত করিয়াই পরিচয় দিয়াছি। পাঠকের কৌতুহল নিবারণার্থ তাঁহার 'ফারুক' নাম হইল কি করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইব।

এবনে-আব্বাছ এবং আয়ূব বিন্ মূছা বলেন, হজরত নবী করিমই স্বয়ং হজরত ওমর রজিয়াল্লাহু তাআলা আন্হুকে "ফারুক" নাম দিয়াছিলেন। আয়ূব বিন্ মূছা হইতে বর্ণিত আছে,—

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله
جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق - فرق الله به
بين الحق والباطل -

অর্থাৎ "রছুলে করিম বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা ওমরের মুখে এবং অন্তরে সত্য নিহিত করিয়াছেন। তিনি ফারুক; কেননা আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ভেদ-রেখারূপে স্থাপন করিয়াছেন।" উম্মুল মো'মেনীন হজরত আয়েশা আবু-ওমর-বিন্-জক্ওয়ানের মারফতে শুধু এই বলিয়া ইহার তছ্দিক্ করিয়াছেন যে, হজরত নবী করিমই তাঁহাকে 'ফারুক' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হজরত আলী বলেন,

ذلك امرؤ سماه الله "الفاروق" فرق الله به بين الحق والباطل --

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক হজরত ওমরের নামকরণ করা হইয়াছে, "ফারুক" ইত্যাদি।" (১)

আর একটী রেওয়ায়েৎ এই মর্ম্মে আছে যে, হজরত ফারুক যখন "তওরিৎ" আলোচনায় যোগদান করিতেন তখন সেই আলোচনার মধ্যে তওরিতের অপভ্রাংশ ও বাজে গল্প শুনিয়া তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতেন এবং যুক্তি সহকারে তাহাদের ভ্রম ভঞ্জনের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার যুক্তিগুলি এহুদীগণের প্রতি এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তাহারা সানন্দ চিত্তে তাঁহাকে 'ফারুক—فارق" নামে অভিহিত করে। অতঃপর মোছলমানগণও তাঁহাকে "ফারুক" নামেই ডাকিতে আরম্ভ করেন। আমার মনে হয়, হজরত ওমরের এছলামে আত্ম সমর্পণ করার পর যেদিন মোছলমানগণ কা'বাগৃহে প্রথম ও প্রকাশ্যে নমাজ পড়িতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই দিনই হজরত রছুলে আকরম তাঁহাকে "ফারুক" নামে অভিহিত করেন। হজরত ওমর-বিন্ খত্তাব হইতে এবনে আব্বাছ রেওয়ায়ৎ করিতেছেন,—

...... دخلنا المسجد فسماني رسول الله صلے الله عليه وسلم يومئذ "الفاروق"

অর্থাৎ "আমরা যখন 'মছজেদে হারামে প্রবেশ লাভ করিলাম, সে হইতে রছুলে মকবুল আমাকে "ফারুক" নামে অভিহিত করেন।" (১) যাহা হউক এই 'ফারুক' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে।

ابن الجوزی

কিন্তু এছলাম গ্রহণের পর হজরত ওমর-বিন্-খত্তাবের গুণবাচক উপাধি 'ফারুক' হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

হজরত ওমর ফারুকের জীবন-কাহিনীর যে সকল বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে 'ফারুক' উপাধির সার্থকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। অতএব এই স্থানে এই বিশেষত্বের বিশেষত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

উচ্চাভিলাষ ও আকাশ-কুসুম, দুঃসাহস ও অসহমসাহসিকতা, ছখাওৎ এবং এছ্রাফ, বিলাসিতা এবং পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি এমন শত শত বিষয় আছে, সাধারণ দৃষ্টিতে যাহাদের ভেদ-রেখা অতিশয় ক্ষুদ্র ও অদৃশ্য। কিন্তু মহা মনীষী হজরত ফারুকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই ভেদ-রেখা এত সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িত যে, তাহা শুধু অনুভব করিবার বস্তু, ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। আমরা তাঁহার সংসার-জীবনের আভাস দিয়া কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার এই সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

হজরত ওমর বিন্ খত্তাব বর্ণে শ্যাম ابيض تعلوه حمرة অর্থাৎ শ্বেতের সহিত রক্তবর্ণের অধিক সংমিশ্রণ হইলে যেরূপ বর্ণের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ছিলেন। আকার তাঁহার দীর্ঘ ছিল; ললাট উন্নত। বদনমণ্ডল বিশুষ্ক, মাংসল ছিল না। গণ্ড ও চিবুকদেশ ঘন শ্মশ্রু পরিশোভিত। হজরত ফারুক এমন দীর্ঘকায় ছিলেন যে, সহস্র সহস্র লোকের মধ্য হইতেও সর্ব্বাগ্রে তাঁহার উন্নত ললাট দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। (১)

নবজীবন লাভের পূর্ব্বে ও পরে হজরত ওমর ফারুক একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন। জীবনে সর্ব্বপ্রথমে তিনি বিবি জায়নবের পাণি-গ্রহণ করেন। ইনি প্রসিদ্ধ ছাহাবী ওছমান বিন্ মজ্উনের সহোদরা

---

(১) ابن الجوزی

ভগিনী। উম্মল-মো'মেনীন হজরত হাফ্ছা এবং আবদুল্লাহ ইঁহারই গর্ভজাত ছিলেন। হজরত হাফ্ছার নামানুসারে হজরত ওমর ফারুক "আবু হাফ্ছ" বা "হাফ্ছার্ বাপ" বলিয়াও অভিহিত হইতেন। হজরত হাফ্ছা উম্মুল-মো'মেনীন হিসাবে এবং আবদুল্লাহ্ হাদিছ-শাস্ত্র-বিশারদ বলিয়া হজরত ফারুকের সন্তানসন্ততিবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিবী জায়নব এছলাম গ্রহণের পর মক্কা মো'আজ্জমায় এন্তেকাল করেন।

হজরত ফারুকের দ্বিতিয়া স্ত্রীর নাম ছিল কোরেবা। ইনি উম্মুল মো'মেনীন হজরত উম্মে ছল্‌মার ভগিনী। এছলাম গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে হোদায়বিয়ার সন্ধির পর হজরত ফারুক তাঁহাকে তালাক দেন। কেননা তখন কোর্‌আন মজিদের বিধানমতে মোশ্‌রেক ও মো'মেনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া যায়। অন্ধকার-যুগের তৃতীয়া স্ত্রী মলিকাকেও তিনি এই একই কারণে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এছলাম গ্রহণের পর হজরত ফারুক আ'ছেমের কন্যা জমিলার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু কোন অনিবার্য্য কারণে আবার তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। উম্মে হাকিম ও আ'তেকা নামে তাঁহার আরও দুই স্ত্রী ছিলেন। আ'তেকা কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অবশেষে খলিফা-জীবনে হিজরী সপ্তদশ সালে তিনি হজরত উম্মে-কলছুমের পাণি-গ্রহণ করেন।

হজরত হাফ্ছা ও আব্দুল্লাহ্ ব্যতীত হজরত ফারুকের সন্তানবর্গের মধ্যে ওবেদুল্লাহ, আ'ছেম, আবু-শাহ্‌মা, আবদুর রহমান, জায়দ এবং আবু-তল্‌হাই প্রসিদ্ধ। আ'ছেম কবি বলিয়া আরবময় বিখ্যাত ছিলেন। ওমর বিন্ আবদুল আজিজ তাঁহারই দৌহিত্র ছিলেন। (১)

(১) ابـــن قتيبـــه

সন্তান সন্ততি ও সহধর্ম্মিগণের প্রতি হজরত ফারুকের স্নেহমমত্বের অধিক আকর্ষণ ছিল না। আল্লামা শিবলী বলেন,—"স্ত্রী পুত্রদিগের প্রতি হজরত ফারুকের তেমন স্নেহাকর্ষণ ছিল না ; অবশ্য কর্ত্তব্যের অনুরোধে যাহা করণীয়, তাহাতে তিনি কোন ত্রুটি করিতেন না !"

পূর্ব্বের ন্যায় ছাহাবী-জীবনেও হজরত ফারুকের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন ছিল বাণিজ্য ব্যবসায়; কিন্তু খেলাফতের গুরুভার গ্রহণের পর হইতে আপন ব্যবসায়ের প্রতি মনোনিবেশ করিবার অবসর তিনি পান নাই। সুতরাং খালিফা হইয়া কিছুদিন পরে মজলিছে শূরার নিকট তাঁহার সমস্ত অবস্থা বিবৃত করতঃ তিনি সরকারী বৃত্তির প্রার্থনা করেন। হজরত আলীর প্রস্তাবানুসারে বায়তুল-মাল হইতে শুধু তাঁহার ভরণপোষণের উপযোগী বৃত্তি নিদ্ধারিত হয়। অবশেষে হিজরীর পঞ্চদশ সালে অন্যান্য ছাহাবীর ন্যায় তাঁহার বার্ষিক ৫০০০ পাঁচ হাজার দেরহাম অজিফা ধার্য্য হয়। এই হিসাবে অর্দ্ধ পৃথিবীর সম্রাট হজরত ওমর ফারুকের মাসিক বৃত্তি ছিল ১৩০৲ একশত ত্রিশ টাকারও কম। দৈনিক দুই দেরহাম বা দশ-আনায় তাঁহার সংসার-ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। বৃত্তির অবশিষ্ট অর্থ তিনি লিল্লাহ্ খয়রাত বা পরদুঃখ মোচনে ব্যয় করিতেন। তিনি ও তাঁহার পরিবারভুক্ত লোকগণ এত সামান্য বস্তু আহার করিতেন যে, সাধারণ মেহ্মান ও মোছাফেরের পক্ষে তাহা ভক্ষণ করা কষ্টকর হইত। সচরাচর মোটা আটার রুটি, গোশ্ত এবং জায়তুনই তাঁহারা আহার করিতেন।

যাঁহার ইঙ্গিতে পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নির্ব্বাপিত এবং পারস্য-শাহেন্শাহের অমূল্য তাজ ভূলুণ্ঠিত ; যাঁহার অঙ্গুলি হেলনে রোম-সম্রাটের স্বর্ণ-সিংহাসন ধূলিসাৎ হইয়াছিল এবং যে মহাবীরের নামে সমগ্র বিশ্বে বিস্ময় ও ত্রাসের সঞ্চার হইত, তাঁহার তাজ-মুকুট বা তখ্ৎ-সিংহাসন কিছুই ছিল না। বহুবার এরূপ দেখা গিয়াছে যে, দূর দূরান্তর হইতে রাজ-

দূতগণ বিশ্বসভ্যতার কেন্দ্র মদিনা নগরীতে উপস্থিত হইয়া বিশ্ববিজয়ী বীর ফারুকে আ'জমের সন্ধান করিতেছেন, আর মহামান্য মোছলেম-সম্রাট অদূরে খেজুর পত্রের মছজেদ-গৃহে প্রহরীবিহীন অবস্থায় বিশ্রাম করিতে-ছেন। আর সেই রাজদূত বিস্মিত ও সম্মোহিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার জয় গান করিতেছেন। বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে রাজদূত অবলোকন করিতেছেন, বহু গ্রন্থিবিশিষ্ট "কামিছ" বা লম্বা কোর্ত্তা এবং সামান্য টুপি মাত্র মোছলেম-সম্রাটের অঙ্গে শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। রাজদূত জীবনে বহু রাজা দেখিয়াছেন; বহু রাজমুকুট, রাজপরিচ্ছদ ও রাজসিংহাসন দেখিয়াছেন; কিন্তু মহিমা ও সৌন্দর্য্যের এরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয় দর্শনে কখনও তিনি নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতে পারেন নাই। ফলতঃ হজরত ফারুক পৃথিবীর অদ্বিতীয় রাজা হইয়াও দীনের ন্যায় কালতিপাত করিতেন। সময়ে সময়ে ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইত যে, দরবার জনসমাকীর্ণ হইয়া আছে; কিন্তু খলিফা গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া দরবারে উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না। কেননা সেই সামান্য কোর্ত্তাটি স্বহস্তে ধুইয়া তিনি রৌদ্রে দিয়াছেন; অথচ তখনও তাহা শুকায় নাই। (১) বিলাস ও সন্ন্যাসের মধ্যে ইহাই ছিল, ত্যাগপূত ফারুকের চিহ্নিত প্রভেদ-রেখা। নিম্নের ঘটনা হইতে বোধ হয়, তাঁহার প্রদর্শিত পথের সন্ধান মিলিবে।

একদা এমন প্রদেশ হইতে জনৈক রাজপুরুষ খলিফা হজরত ফারুকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তখন চাকচিক্যময় ও আড়ম্বর পূর্ণ পরিচ্ছদই তাঁহার পরিধানে ছিল। সেই পরিচ্ছদ দেখিয়া হজরত ফারুক রাজকর্ম্মচারীকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেন। রাজপুরুষ নিতান্ত লজ্জিত মনে কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া গেলেন। বারান্তরে সেই রাজপুরুষ অতি জীর্ণ

(১) ابن الجوزی

ও পুরাতন বস্ত্র পরিয়া ফারুকের সমীপে উপস্থিত হন। তদ্দর্শনে হজরত ফারুক ক্ষুণ্ণ হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, বৈরাগ্য ও বিলাসিতা দুইই পরিত্যজ্য। বিলাসের বাহ্যাড়ম্বর ও সন্ন্যাসের বিভূতি এই দুয়ের মাঝ খানে যে সরল পথ বাস্তবপক্ষে উহাই মানুষের পক্ষে অবলম্বনীয়। (১)

হজরত ফারুকের নিকট শরিয়ৎ-বিগর্হিত না হইলে কোন কার্য্যই হেয় ছিল না। সময়ের অভাব যেন তাঁহার কখনও হইত না। খেলাফতের বিপুল কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক তিনি অবসর সময়ে গরীব বিধবার ঘরে পানি বহন করিতেন, সরকারী উষ্ট্রের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন। মোজাহেদদিগের পরিবারের সম্যক অবস্থা নিজে অনুসন্ধান করিতেন, তাহাদের পত্রাদি স্বহস্তে লিখিয়া দিতেন। তাঁহার এই কর্ত্তব্য সম্পাদনের দ্বারা খেলাফতের অপেক্ষাকৃত গুরু ও দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে কখনও ক্রুটি হইত না। প্রত্যেক কর্ত্তব্যই তিনি যথা-সময়ে সম্পাদন করিতেন। একদা একটী সরকারী উট হারাইয়া গিয়াছিল। হজরত ফারুক সেই উট খুঁজিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিলেন। এমন সময়ে আহ্‌নফ বিন্ কায়ছকে দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন—"বায়তুল-মালের একটি উট হারাইয়া গিয়াছে। এই উটের প্রতি কত গরীবের অংশ আছে, তাহা অবশ্য তুমি জান। চল উটটী খুঁজিয়া দেখি।" প্রত্যুত্তরে আহ্‌নফ বলিলেন,—"আমিরুল মোমেনীন! কোন গোলামকে বলিলেই উটটী খুঁজিয়া আনিবে।" তখন বিশ্ববরণ্যে পুরুষ রাজর্ষি ফারুক তাহার উত্তর করিতেছেন,—

ای عبد اعبد منی

"অমাপেক্ষা অধম গোলাম আর কে?" (২)

---

(১) طبری

(২) ازالۃ الخفا

দুঃখী-দুঃস্থের খাতিরে তিনি 'বায়তুল-মালের' সমস্ত ধন নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছেন, কিন্তু এক বিন্দু মধুর অপব্যয় হইতেছে কিনা তৎপ্রতি তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি থাকিত। একবার হজরত উম্মে-কুল্‌ছুম সরকারী বেহারার মারফতে কায়ছর-রাণীকে কয়েক শিশি আতর উপহার পাঠাইয়াছিলেন। কায়ছর-পত্নী তাহার পরিবর্তে মুক্তাপূর্ণ করিয়া সেই সকল শিশি প্রত্যর্পণ করেন। হজরত ফারুক ব্যাপার জানিতে পারিয়া সেই মুক্তার শিশিগুলি বায়তুল-মালে পাঠাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে বিবি উম্মে কুল্‌ছুমকে বলিলেন, "সরকারী কাছেদ বহন করিয়া না আনিলে উহা তোমারই প্রাপ্য হইত।"

একদা হঠাৎ ঔষধের অনুপানরূপে হজরত ফারুকের সামান্য পরিমাণ মধুর আবশ্যক হয়। বায়তুল-মালে যথেষ্ট মধু সঞ্চিত ছিল। কিন্তু খলিফা ফারুক তাহা হইতে এক বিন্দু মধু লইয়া অনুপান করিবার সাহস করিলেন না। মছজেদে নববীতে জনসাধারণের সম্মুখে এক বিন্দু মধু ভিক্ষা করিতে চলিয়া গেলেন। (১) মহামান্য ফারুকের মতে বায়তুল-মালের প্রতি খলিফার বা রাজকোষের প্রতি রাজার অধিকার এইরূপ।

ছকরাত (সক্রেটিস্) বলিতেন, তাঁহার স্বভাব নিতান্ত দুষ্কার্য্য-প্রবণ ছিল। কিন্তু অসাধারণ সংযম বলে তিনি উহার দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হজরত ফারুকের প্রকৃতি স্বভাবতঃ দুষ্কার্য্যপ্রবণ ছিল না সত্য; কিন্তু ঔদ্ধত্য যেন তাঁহার স্বভাবগত ছিল। কিন্তু মোস্তফা সাহচর্য্যের ফলে যে অনন্যসাধারণ সংযম অভ্যাস দ্বারা

(১) كنز العمال

তিনি উহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয় সংযমে তিনি যেন ছকরাত হইতেও ছবকৎ লইয়া গিয়াছেন।

হজরত আবুবকর ছিদ্দিকের পর খেলাফতের পূণ্যময় মিম্বরে দাঁড়াইয়া প্রথম খোৎবায় তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

اللهم انی غلیظ فلینی اللهم انی ضعیف فقونی

"হে আল্লাহ! আমি উদ্ধত, তুমি আমাকে সংযত কর। হে আল্লাহ! আমি দুর্ব্বল, তুমি আমাকে শক্তি দাও।"

একদা মিম্বরে দাঁড়াইয়া খোৎবা দান কালে বলিতে লাগিলেন,— "এমন একদিন ছিল, যখন লোকের ঘরে ঘরে পানি বহিয়াই আমাকে জীবন ধারণ করিতে হইত।" শ্রোতাগণ এই অভিভাষণের ব্যাখ্যা চাহিলে তদুত্তরে তিনি বলেন, **"আমার মনে একটু গর্ব্ব উপস্থিত হইয়াছিল, সেই গর্ব্ব ধ্বংসের পক্ষে ইহাই হইল উচিত প্রতিবিধান"।**

হজরত ফারুক দানে মুক্তহস্ত ছিলেন; কিন্তু অপাত্রে দান তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। একদা এক ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিল। হজরত ফারুক তাহার ঝুলির প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ করিলেন যে, উহা আটাতে পরিপূর্ণ। এতদ্দর্শনে হজরত ফারুকের ভীষণ রাগ উপস্থিত হইল। ভিক্ষুকের ঝুলি কাড়িয়া লইয়া তিনি সমস্ত আটা উটকে খাইতে দিলেন। তারপর সেই ভিক্ষুককে বলিলেন, সত্য সত্যই তুমি অভাবগ্রস্ত হইয়াছ, এইক্ষণ তুমি ভিক্ষা চাহিতে পার। তিনি সাধারণ ভাবে লোকদিগকে উপদেশ দিতেন,—

مكسبة فيها دناءة خير من مسألة الناس

ভিক্ষাপেক্ষা যে কোন সামান্য পেশাই শ্রেয়ঃ

আলেমদিগকে সম্বোধন করিয়া হজরত ফারুক বলিতেন,—

لا تكونوا عيا لا على المسلمين

"তোমরা মোছলমানদিগের গলগ্রহ হইও না।"

পাঠকগণ পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন যে, হজরত ফারুক মছজেদের এমাম ও মোঅজ্জেন এবং মক্তবের শিক্ষকবর্গের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ওয়াজ নছিহৎ বা ধর্ম্ম-শিক্ষা ও সমাজ-সেবার পারিশ্রমিক সম্বন্ধে তাঁহার এই উক্তি প্রযুজ্য নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। এমন কি সর্ব্বপ্রথমে যখন তিনি রাজকার্য্যের জন্য ছাহাবীগণের যথাযোগ্য ভাতা নির্দ্ধারণে বদ্ধপরিকর হন, তখন অনেক ছাহাবী উহা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। হজরত ফারুক নানা প্রকার যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাইয়া তঁহাদিগকে সম্মত করেন। এমতাবস্থায় আলেম সম্প্রদায়কে মোছোলমানদিগের নিকট হইতে কোন্ শ্রেণীর দান গ্রহণে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ চিন্তা করিয়া স্থির করুন।

পূর্ব্বতন জীবনীলেখকগণ হজরত ফারুকের বিনয় ও সরলতা, সততা ও সুজনতা, সংযম ও সহনশীলতা, ত্যাগ ও নিষ্ঠা, দয়া ও দাক্ষিণ্য, সাহস ও বিক্রম, ধর্ম্মপ্রাণতা ও ধর্ম্মভীরুতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি গুণ রাজি লইয়া দীর্ঘ আলচনা করিয়াছেন। আমি ও যথাস্থানে সে সমুদয়ের সঙ্ক্ষিপ্ত আভাস দিয়া আসিয়াছি। এস্থলে পুনরায় তাহারা ছবি আঁকিতে যাইবনা। তাঁহার পরকাল-চিন্তার আভাস দিয়াই এই পুস্তকের উপসংহার করিব।

---

(১) ابن الجوزی

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর দিবাভাগে নফল এবাদতের নিমিত্ত তিনি অবসর পাইতেন-না। নফল এবাদত অপেক্ষা তিনি খেলাফৎ সংক্রান্ত কর্ত্তব্য সম্পাদনকেই অগ্রগণ্য মনে করিতেন। কিন্তু রাত্রিকালে অবসর সময়ে নফল নামাজ পড়িতেন। ছোব্‌হে ছাদেক উপস্থিত হইলে পরিবারের লোকদিগকে জাগ্রত করিতেন। এই জাগরণের উদ্দেশ্যে তিনি وأمر باهلك بالصلوة "পরিবারের লোকদিগকে নমাজের আদেশ কর।" আয়ৎ পড়িতেন।"

নমাজ বা-জমাআৎ আদায় করিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। তিনি বলিতেন, "বা-জমাআৎ নামাজকে আমি সমস্ত রাত্রির এবাদৎ অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যজনক মনে করি।" ফজরের নমাজে 'করাআৎ' খুব দীর্ঘ করিতেন। তবে ১২০ আয়াতের অধিক পড়িতেন না।

জুম্‌আর খোৎবায় ধর্ম্মালোচনার সহিত তিনি সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা করিতেন। খোৎবা দানকালে ব্যক্তিবিশেষের সহিত আবশ্যকীয় বিষয় লইয়া প্রশ্নোত্তর করিতেন। একদিন জুম্‌আর জমাআতে হাজির হইতে হজরত ওছমানের কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। হজরত ফারুক মিম্বরে দাঁড়াইয়া খোৎবা দান করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি আসিয়া উপস্থিত হন। হজরত ফারুক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এত দেরী হইল কেন?" হজরত ওছমান নিজের কৈফিয়ৎ হিসাবে বলিলেন,—"বাজারে গিয়াছিলাম, ফিরিবার সময় আজান শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি অজু করতঃ এই হাজির হইলাম।" উত্তর শুনিয়া হজরত ফারুক বলিলেন, "কেন, অজুতে তোমার তৃপ্তি হইল কেন? হজরত রছুলে আকরম ত গোছলের ব্যবস্থা দিয়াছেন।"

নফল রোজা রাখা সম্বন্ধে তাঁহার অভ্যাস কিরূপ ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, শাহাদতের দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি সম্বৎসর রোজা করিতেন। আর এক রেওয়ায়েতে দেখা যায়, 'কোন ব্যক্তি সম্বৎসর রোজা রাখে', এই কথা শ্রবণ মাত্র হজরত ফারুক তাহাকে কশাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। (১)

হজব্রত উদ্‌যাপনের প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। মীর কাফেলা হইয়া তিনি প্রতি বৎসর হজ্‌যাত্রা করিতেন। খলিফা-জীবনে হজের মহা সম্মিলনে তিনি অতি মূল্যবান ও সারগর্ভ খোৎবা দান করিতেন। ফল কথা, হজরত ফারুক এছলামের আদর্শ সন্তান ছিলেন। পরধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি তিনি অতিশয় উদার ছিলেন। (২)

(১) ازالة الخفا

(২) অধম গ্রন্থকার নিজের জীবনে দেখিয়াছি, কোন সরকারী মাদ্রাছার মোদররেছে আ'লা বা হেড মৌলবী খ্রীষ্টান লাটের সহিত করমর্দ্দন করিয়া বিলাতী সাবানের দ্বারা ভালমতে হাত ধুইয়া মুছিয়া সেই খৃষ্টানী গন্ধ দূর করতঃ তাঁহার 'ছুফী-গিরী' বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু হজরত ফারুক খৃষ্টানের পানির দ্বারা অজু করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। এতৎসম্পর্কে শাহ্‌ অলিউল্লাহ্‌ ছাহেব এমাম বোখারী ও এমাম শাফেঈর নিম্নোদ্ধৃত রেওয়ায়ৎ স্বীয় পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

توضأ من ماء جيء به من عند نصرانية

অর্থাৎ হজরত ফারুক কোন নছরানীর নিকট হইতে পানি আনাইয়া অজু করিয়াছিলেন।

ঈছাই বা খৃষ্টানদিগের প্রস্তুত পনির খাওয়াও তিনি মোছলমান দিগের জন্য জায়েজ বিবেচনা করিতেন।

হজরত ফারুক কেয়ামতের শেষ-বিচারকে বড়ই ভয় করিতেন। কেয়ামতের কথা তিনি কখনও ভুলিতেন না। বোখারী শরীফে আছে, একদা তিনি আবু-মূছা আশ্‌আরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি মনে কর যে, আমরা এছলাম কবুল্‌ করিয়াছি, হিজরৎ করিয়াছি এবং রছুলের চরণ-সেবা করিয়াছি বলিয়া পরকালে রেহাই পাইব?" আবু-মূছা বলিলেন,—"আমিত আরও অনেক আশা করি।" তদুত্তরে হজরত ফারুক আবার বলিলেন,—"আমিত রেহাই-ই চাই।" প্রাণবায়ুর নির্গমনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি বারবার আবৃত্তি করিতেছিলেন,

ظلوم لنفسی غیرا نی مسلم -اصلی الصلوۃ کلہا اصوم

"আমি জীবনে বহু অন্যায় কার্য্য করিয়াছি; মাত্র এই বলিতে পারি যে, আমি মোছলেম, আমি নমাজ আদায় করিয়াছি এবং রোজা করিয়াছি।

تم الكتاب والحمد لله وحده وصلواته علی سيد نا خاتم
النبيين وآله واصحابه وازواجه اجمعين

ফারুক-চরিত

সুচী